জোছনার ফুল

হুমায়ূন আহমেদের টেলিভিশন ধারাবাহিক অবলম্বনে

scaned and edited
by
MD: Amit Basunia
For
www.amitpedia.blogspot.com

এই বইটি অমিতপিডিয়া সৌজন্যে নির্মিত এবং পরিবেশিত।
পিডিএফ করার উদ্যোগ কোনভাবেই বাণিজ্যিক স্বার্থ-সংশিষ্ট নয়।
বই কিনে পড়ার সুবিধা বঞ্চিত পাঠকদের জন্য নিঃস্বার্থভাবে
এই পিডিএফ তৈরি করা কেবল। কিনে পড়ার সামর্থ্য থাকলে
নিকটস্থ বুকস্টল অথবা হকারের কাছ থেকে
আজই বইটি সংগ্রহ করুন।
লেখক অথবা প্রকাশনা সংস্থার ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

আমাদের ওয়েবসাইট
www.amitpedia.blogspot.com
আমাদের ফেসবুক গ্রুপ
www.fb.com/booksarchivedotcom

The kingdom of pdf Book
AMIT PEDIA

স্কান ও এডিট করেছেন
মোঃ অমিত বসুনিয়া
www.fb.com/amit.shohorab

উৎসর্গ

সেইসব শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে
যাঁরা
বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে
নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন

জোছনার ফুল

মুখবন্ধ

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত শওকত গ্রামে ফিরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেয়। উদ্দেশ্য- গ্রামের সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করা। অতি অল্প সময়েই সে গ্রামের সকলের প্রিয় মানুষ হয়ে ওঠে। তবে শওকতের এই জনপ্রিয়তা তাকে কিছু মানুষের চক্ষুশূলও করে তোলে। প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহমান তেমনি একজন। তবে শওকত জানে, গ্রামে শিক্ষার প্রসারের জন্য এসব মানুষের সহযোগিতা তার প্রয়োজন। সে তার ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি তাদের অভিভাবকদেরও সচেতন করে তুলতে চেষ্টা করে।

আমিন সাহেব গ্রামের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। গাম্ভীর্য আর আজব সব খেয়ালের কারণে গ্রামবাসীরা তাঁকে এড়িয়ে চললেও আসলে মনের দিক থেকে তিনি ভাল মানুষ। শওকতকে তিনি ভালবাসেন। শওকতের উন্নয়নমূলক কাজে উৎসাহ যোগান। আমিন সাহেবের একমাত্র মেয়ে যূথী, মেয়েকে তিনি অসম্ভব ভালবাসেন। একটি ভাল ছেলের সাথে তিনি যূথীর বিয়ে দিতে চান। কিন্তু রহস্যময় কোনো কারণে সে বিয়ে ভেঙে যায়। এরকম সময়ে ঢাকা থেকে শওকতের বন্ধু ফরিদ গ্রামে আসে। ফরিদ ভাল ছাত্র, সে ছবি তুলতে পছন্দ করে- নিসর্গের ছবি। কুসুমপুর গ্রামের মানুষ ও প্রকৃতির ছবি তোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে সে। শিক্ষাদান পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য আনতে বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহারের বিষয়ে শওকতের সাথে তার নানারকম পরিকল্পনা চলে। ফরিদ বিভিন্নজনের ছবি তোলার ফাঁকে একসময় যূথীরও কিছু ছবি তোলে। ঢাকায় ফিরে যাওয়ার পর যূথীর ছবিগুলো তার ঘরের দেয়ালে টাঙালে তার বাবা-মা আর ছোটবোন নীলাসহ সবাই কৌতূহলী হয়ে ওঠে। নীলা ফরিদকে নিয়ে চলে আসে কুসুমপুর গ্রামে যূথীকে দেখার জন্য। শওকতের সাথে নীলার পূর্বপরিচয় থাকলেও নীলা যেন নতুন এক শওকতকে খুঁজে পায়। নীলাও প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিনোদনের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার, অভিভাবকদের সচেতন করার কাজে নেমে পড়ে। নীলা এক পর্যায়ে যূথীকে ফরিদের সাথে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু যূথী অপ্রত্যাশিতভাবে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ক্ষুব্ধ নীলা অবিলম্বে কুসুমপুর ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

যূথী ইতোমধ্যে শওকতের সাথে শিশুদের লেখাপড়া নিয়ে আলোচনা শুরু করে। যেসব ছেলেমেয়ে স্কুলে যেতে পারেনি যূথী তাদের মনীষীদের জীবনী পড়ে শোনায়, গল্প ও ছড়া পড়ে শোনায়। নীলার মতো যূথীও আসলে শওকতকে ভালবাসে। কিন্তু শওকত তার মনের অবস্থা কাউকেই জানতে দেয় না। সে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যায়

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে ও মানুষের নেতিবাচক মানসিকতা পরিবর্তনে।

এ উপন্যাসে আরো কিছু চরিত্র আছে যারা এই সমাজেরই মানুষ, পুরনো ধ্যান-ধারণা নিয়ে যাদের বসবাস। শওকত উপন্যাসের প্রধান চরিত্র, যে কিনা নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে শিক্ষার সংস্কারের মাধ্যমে কুসুমপুর গ্রামের উন্নয়নে। আমাদের সমাজে একজন শিক্ষক তাঁর ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং অন্যান্য মানুষের কাছেও অনুসরণীয় আদর্শের মতো। একজন সফল শিক্ষকের সততা, নিষ্ঠা, আচরণ সবই সামাজিক সংস্কৃতি পাল্টে দিতে সক্ষম। 'জোছনার ফুল' উপন্যাস এ সমাজের প্রতিটি শিক্ষকের প্রাত্যহিক জীবনের গল্প। তাঁদের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করা হলো এই উপন্যাস।

জোছনার ফুল

এক

প্রতিদিনের মতো আজও মজিদ জঙ্গলে ঢোকে ঘুঘু শিকার করতে। জঙ্গলের খানিকটা জায়গা সে পরিষ্কার করে নেয়। জঙ্গলের শুকনো পাতা দিয়ে আগুন জ্বেলে ভাত রাঁধবে। নানা রকম পাখির শব্দের মধ্যে ঘুঘু পাখির ডাকও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। মজিদের খাঁচায় বন্দী করা একটি ঘুঘু পাখি আছে। এই ঘুঘুটিকে ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করে সে অন্য ঘুঘু ধরে। পাখির ডাক শুনতে শুনতে মজিদের ভাত হয়ে যায়। পেঁয়াজ আর কাঁচা মরিচ দিয়ে সে খুব আগ্রহ নিয়ে গরম ভাত খায়। ভাত খেতে খেতে মজিদ হঠাৎ আবিষ্কার করে তার পেছনে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক শওকত দাঁড়িয়ে। শওকত ভাবুক ধরনের মানুষ। বয়স বেশি নয়।

শওকতকে দেখে মজিদ বলে, আরে মাস্টার সাব, আপনে দেখি বিড়ালের মতো হাঁটেন। কখন পেছনে আইসা দাঁড়াইছেন খবর পাই নাই।

পাখি ধরা পড়েছে ?

পাখি ধরা এখনো শুরু করি নাই। খাওয়া দাওয়া কইরা একটা ঘুম দিব। পাখি ধরা শুরু করবো বৈকালে। ঘুঘু বৈকাল ছাড়া ধরা দেয় না। আপনে জঙ্গলের মধ্যে কী করেন ?

তুমি জঙ্গলে আসতে পার, আমি পারি না ?

আপনার কাজটা কী ?

সেটা তোমারে বলব না। তুমি খাওয়া দাওয়া কর। আমি চললাম।

সবেই বলাবলি করে আপনি নাকি খুবই ভাল মানুষ। এইটা কি সত্য ?

তোমার কী মনে হয় ?

বুঝি না। আমি পাখির কাজকর্ম বুঝি, মানুষেরটা বুঝি না। মানুষ বেজায় জটিল জিনিস।

বোঝার চেষ্টা কর। তাহলে বুঝতে পারবে।

শওকত জঙ্গল থেকে বের হয়ে আসে। গ্রামের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শওকত মাঠের পাশে চলে আসে। মাঠে একদল ছেলে জাম্বুরা দিয়ে ফুটবল খেলছে। শওকতকে দেখে তারা খেলা থামিয়ে দেয়। তাদের একজন শওকতকে সালাম দেয়। শওকত সালামের উত্তর দেয়। তারপর আরেকজন সালাম দেয়। শওকত তার সালামেরও উত্তর দেয়। একে একে সব ক'টা ছেলে সালাম দেয়। শওকত সবার সালামের উত্তর দেয়। এক পর্যায়ে সবাই একসাথে বলে ওঠে 'আস্‌সালামুআলাইকুম'। সবাই এক সাথে সালাম দেওয়ায় শওকত খুব মজা পায়। সে হাসতে হাসতে বাড়ির পথ ধরে।

হাতে একটা লেবুর চারা আর মুখে রাজ্যের চিন্তা ও বিরক্তি নিয়ে খেয়াঘাটের দিকে যাচ্ছেন প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুর রহমান। ঘাটে এসে দেখেন নৌকা অন্য

পাড়ে। তিনি কুদ্দুসের চায়ের দোকানে বসলেন। কুদ্দুস প্রধান শিক্ষক সাহেবকে চা দেয়। তিনি খুব বিরক্তি নিয়ে চা খেতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ আগে গ্রামের মাঠে ছেলেপুলেদের শওকতকে সালাম দেওয়ার দৃশ্যটা তিনি দেখেছেন। ব্যাপারটা তার কাছে মোটেই ভাল ঠেকেনি। শিক্ষক হলো ভয় পাওয়ার মতো একটা জীব। পোলাপান তাকে শ্রদ্ধা করবে। ভয় পাবে। তার সাথে ঠাট্টা মসকরা করার সাহস আসে কোথা থেকে।

ঘাটে নৌকা এসে ভিড়ে। ও পার থেকে আসা যাত্রীরা নেমে যেতেই প্রধান শিক্ষক সাহেব গম্ভীর মুখ নিয়ে নৌকায় গিয়ে ওঠেন। ওঠার সময় একজন সালাম দেয়। উত্তরে তিনি কেবল মাথা ঝাঁকান।

এই ধরনের হাবভাবের জন্য গ্রামের মানুষ প্রধান শিক্ষক সাহেবকে পছন্দ করে না। এমনকি ঘরের স্ত্রীও তাকে খানিকটা বাঁকা চোখে দেখে।

তার স্ত্রী জুলেখা এমনিতে খুব হাসিখুশি মহিলা। বেশ বুদ্ধিমতিও। ঘরের দরজায় বসে আছেন তিনি। আবদুর রহমান সাহেব লেবুর চারা নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢোকেন। ঢুকেই তিনি লেবুর চারা লাগানোতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। চারা লাগানোর সময় জুলেখা বলে, 'আপনার হাতেতো গাছ হয় না'। এ কথা শুনে প্রধান শিক্ষক সাহেবের মেজাজ আরো খারাপ হয়ে যায়। তিনি অতি কষ্টে নিজেকে সংযত রাখেন। স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করলেন না। গাছ লাগানো শেষ হলে তিনি ঘরের দরজার দিকে যান। জুলেখা বদনায় করে পানি নিয়ে আসে স্বামীর হাতমুখ ধোয়ার জন্য। আবদুর রহমানের হাতে পানি ঢালতে ঢালতে হঠাৎ জুলেখা হাসিতে ভেঙে পড়ে।

আবদুর রহমান বলেন, হাসছ কেন ?

হাসতে হাসতেই জুলেখা বলে, আপনার লেবু গাছটার দিকে একটু নজর কইরা দেখেন।

আবদুর রহমান সেই দিকে তাকাতেই দেখতে পান একটা বাছুর পরম তৃপ্তি নিয়ে লেবু গাছের আগা খাচ্ছে। রাগে আবদুর রহমানের মুখ কালো হয়ে যায়।

প্রায় পুরোটা গ্রাম ঘুরে বাড়ি এসে শওকত খেতে বসে। তার বিধবা খালা রহিমা আজ ছোট মাছ রান্না করেছে। রহিমার রান্নার হাত খুব ভাল। শওকতের ধারণা রহিমা পোলাও কোর্মা যেমন ভাল রাঁধে ছোট মাছও তেমনি ভাল রাঁধতে পারে। শওকতকে ভাত বেড়ে খাওয়াতে খাওয়াতে রহিমা বলে, আমিন সাহেব তোকে ডেকেছেন। কেউ কোনো ঝামেলা না বাঁধালে আমিন সাহেব সাধারণত ডাকেন না। তাই রহিমার ধারণা শওকত কোনো ঝামেলা বাঁধিয়েছে। রহিমা পুনরায় বলে, এম. এ পাশ দিছস, গ্রামে পইড়া আছস ? শহরে গিয়া বড় চাকরি করবি, তা না। এখানে পইড়া মরস। শওকত

রহিমার কোনো কথার জবাব দেয় না। এক মনে ভাত খেয়ে ওঠে। তাকে একটু বিরক্ত মনে হয়।

আমিন সাহেব তার বাড়ির উঠানে ইজি চেয়ারে শুয়ে আছেন। গ্রামের মাথা তিনি। এই গ্রামে তার উপরে কেউ কথা বলে না। ধনাঢ্য ব্যক্তি। একমাত্র মেয়ে যূথীকে নিয়ে তার সংসার। আর আছে কাজের লোক। ইয়াকুব তার খাস লোক। আমিন সাহেবের যাবতীয় নির্দেশ পালন করাই তার কাজ। ইজি চেয়ারে শুয়ে শুয়ে আমিন সাহেব বৈদ্যুতিক পাখার বাতাস খাচ্ছেন। পাখাটা প্রথমে এমনভাবে সেট করা হয়েছে, সমস্ত বাতাস আমিন সাহেবের পেটে লাগছিল। এতে তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, পেটে বাতাস দিচ্ছ কেন ? আমার পেট যথেষ্ট ঠাণ্ডা আছে। মাথা সামান্য গরম আছে। বাতাস মাথায় দাও। শওকত এসে পাখাটি ঠিক করে দেয়। এমন সময় এসে ঢোকে শওকত। শওকত আমিন সাহেবকে সালাম দেয়। কুশলাদি জিজ্ঞেস করে আমিন সাহেব তাকে ইজি চেয়ারের পাশে সাজানো চেয়ারে বসতে বলেন।

আমিন সাহেব বলেন, লোকজনের কাছে আমার নামে আজেবাজে কথা কেন বলতেছ বুঝলাম না।
শওকত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, আজেবাজে কথা বলতেছি ?
তোমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক সাহেবের কাছে শুনলাম। তুমি তাকে বলেছ, আমিন সাহেব অতি দুষ্ট প্রকৃতির লোক। তোমার হাতে ক্ষমতা থাকলে তুমি আমারে গ্রাম থেকে বাইর কইরা দিতা।
চাচাজি এই ধরনের কথা আমি বলি নাই।
তাহলে কি উনি কথাগুলি বানিয়ে বলেছেন? উনি শিক্ষক মানুষ, মিথ্যা কথা কেন বলবেন ?
শওকত কোনো কথা বলে না। আমিন সাহেব পুনরায় বলেন, আচ্ছা যাই হোক। তুমি আমাকে দুষ্ট লোক বলেছ, মিথ্যা বল নাই। আমি আসলেই দুষ্ট লোক।
চাচাজি আপনাকে নিয়ে এই ধরনের কথা আমি বলি নাই।
তুমি এই ধরনের কথা বল নাই এইটা আমি জানি। তোমারে আমি পছন্দ করি।
চাচাজি আমি যাই।
যাও। আমার কন্যার যে বিবাহ দিতেছি শুনেছ ?
জ্বি শুনেছি।
আমার একটাই মেয়ে। তার মা নাই। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে বাঁচব কীভাবে ? এই জন্য ছেলে আনতেছি ঘরজামাই। আমার বাড়িতে থাকবে। ভাল বুদ্ধি না ?
জ্বি না ভাল বুদ্ধি না।

আচ্ছা যাও। আমার সামনে থেকে যাও। আমার বুদ্ধির খুব বেশি টানাটানি হইলে তোমার কাছে বুদ্ধির জন্য যাব। এখনো টানাটানি পড়ে নাই।
শওকত সালাম দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। পথে যূথীর সঙ্গে দেখা।

ঘুরে ঘুরে নিজেদের সবজি ক্ষেত দেখছে যূথী। শওকতকে দেখেই যূথীর ভেতরটা কেঁপে ওঠে। সে মনে মনে একটা ফন্দি আঁটে। নিজেকে সামলে নিয়ে খুশি মনে শওকতকে তার বিয়ের খবর দেয়। মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে আমিন সাহেব সার্কাস পার্টির কাছ থেকে একটা হাতি কিনে এনেছেন। যূথী সেই খবরও শওকতকে দেয়।
যূথীর সাথে কথা শেষ করে শওকত পথে নামে। কিছুদূর আসতেই আমিন সাহেবের হাতির সাথে দেখা। টুনটুন করে ঘণ্টা বাজিয়ে হেলেদুলে চলছে হাতি। শওকতকে দেখে হাতি চলা থামিয়ে দেয়। মাহুতের নির্দেশ মতো হাতি শওকতকে সালাম দেয়।

পুকুর ঘাটে হাতমুখ ধুচ্ছিল শওকত। দু'টি ঘুঘু পাখি নিয়ে সেখানে হাজির হয় মজিদ। মজিদের কাছ থেকে কুড়ি টাকায় ঘুঘু দু'টি কিনে আকাশে উড়িয়ে দেয় শওকত। মুগ্ধ দৃষ্টিতে পাখি দুটির উড়ে যাওয়া দেখে সে। শওকতের এই কাজটি মজিদের মোটেই ভাল লাগে না। সে খুব বিরক্ত হয়। এত কষ্টে ধরা ঘুঘু ছেড়ে দিল শওকত মাস্টার!

জোছনার ফুল

দুই

ভোরের ট্রেনে রওনা হয়ে দুপুর নাগাদ এসে পৌঁছে ফরিদ। ফরিদ উচ্চশিক্ষিত যুবক। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে পিএইচডি করছে। দেশে এসেছে বেড়াতে। ছবি তোলা তার হবি। নান্দাইল স্টেশনে নেমে সে মুগ্ধ হয়ে এদিক ওদিক দেখে। ফরিদ মনে মনে বলে গ্রামের স্টেশন এত সুন্দর হয়। কাঁধে ঝোলানো দামী ক্যামেরাটা দিয়ে একের পর এক ছবি তুলতে থাকে। ভারী স্যুটকেসটা একজন কুলির মাথায় দেয় ফরিদ। সামনে এগুতে এগুতে কথা বলে দু'জন। কুলি জিজ্ঞেস করে- নান্দাইল কার বাড়িত যাইবেন ?
ফরিদ জবাব দেয়, আমার এক বন্ধুর বাড়িতে যাব। ওর নাম শওকত। শুনেছি সে কোন এক প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করে। তাকে চেন ? তড়িঘড়ি করে কুলি জবাব দেয়, ও আল্লা তাকে চিনব না কেন ? ভাবুক স্যার। কুলির কথায় ফরিদ বিস্মিত হয়। বলে, ভাবুক স্যার মানে ? কুলি বলে, সবাই তারে ভাবুক স্যার ডাকে। নদীর ধারে একা বইসা থাকে, চুপচাপ ভাবে।

ফরিদ আপন মনে বলে ওঠে, আগের মতই আছে। কুলি কথা বলতে থাকে, ভাবুক স্যার খুবই ভাল মানুষ। আপনি ওনার যখন বন্ধু তখন আপনেও ভাল মানুষ। ভাল মানুষের বন্ধু হয় ভাল মানুষরা। চোরের বন্ধু হয় চোর।

কুলির কথায় ফরিদ হেসে ফেলে। কুলি বলে, রিকশা নেন, আপনে একজন ভাল মানুষ। ভাল মানুষ আমারে দিয়ে অতো পথ হাঁটাইব। এইটা উচিত না। কুলির কথা শুনে ফরিদ একটা রিকশাভ্যান নেয়। ভ্যানে উঠতে উঠতে আরো কিছু ছবি তোলে ফরিদ। ভ্যান এগিয়ে চলে।

আমিন সাহেবের বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ফরিদ দেখে বাড়ি সাজানো হচ্ছে। সে কুলিকে জিজ্ঞেস করে কী ব্যাপার ? কুলি বলে, এইটা আমিন সাহেবের বাড়ি। এই এলাকার মান্য লোক তিনি। মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে বাড়ি সাজানো হচ্ছে। সার্কাস পার্টির কাছ থেকে হাতি কেনা হয়েছে। সেই হাতিতে চড়ে স্টেশন থেকে জামাইকে আনা হবে। আমিন সাহেব সৌখিন মানুষ। তাঁর দৌড়ের নৌকাও আছে।

অতি শখ করে কেনা আমিন সাহেবের হাতিটাকে খাবার দেওয়া হচ্ছে। তা তদারক করতে আসেন আমিন সাহেব। সাথে ইয়াকুব। মাহুত হাতিকে খাবার দিচ্ছে। আমিন সাহেব মাহুতের কাছে জানতে চান হাতি কী কী খাবে ? মাহুত বলে, দিনে এক মন ধান আর পাঁচ কেজি ভেলি গুড়। নাস্তা হিসেবে কলা গাছ যে কয়টা খাবে তার কোনো হিসাব নাই। দশটা দিলে দশটা খাবে। হাতির খাবারের বহর দেখে আমিন সাহেবের শখ মিটে যায়। মেয়ের বিয়ের পরপরই হাতি বিদায় করার ব্যবস্থা নিতে তিনি নির্দেশ দেন ইয়াকুবকে। আমিন সাহেব বলেন, হাতি কেনাটাই ভুল হইছে। এই কথার উত্তরে ইয়াকুব বলে, ভুল হয় নাই। হাতি কেনার কারণে আপনার নাম ফাটছে। দু'দিন পরে লোকজন আমরার এই বাড়িকে বলবে হাতি বাড়ি। ইয়াকুবের এই কথা শুনে আমিন সাহেবের রাগ সপ্তমে চড়ে, তিনি ধমক দিয়ে বলেন, চুপ থাক। গাধা যদি পালতাম তাহলে লোকজন এই বাড়িরে কী বলতো, গাধা বাড়ি ? ধমক খেয়ে ইয়াকুব মাথা চুলকায়। আমিন সাহেব রাগী কণ্ঠে পুনরায় বলেন, পুশকুনিতে মাছ মারব। মাছ মারার ব্যবস্থা কর। সঙ্গে সঙ্গে ইয়াকুব মাছ মারার ব্যবস্থায় ছোটে।

স্কুলের সামনের মাঠে ছাত্র আর শিক্ষকরা এসেম্বলির জন্য দাঁড়িয়েছে। স্কুল আঙিনার একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে ফরিদ। জাতীয় সংগীত হচ্ছে। ফরিদ এসেম্বলির ছবি তুলছে। গান শেষ হওয়া মাত্র শওকত দৌড়ে গিয়ে ফরিদকে জড়িয়ে ধরে। দু'জন দু'জনকে ধরে চক্রাকারে ঘোরে। এই দৃশ্য দেখে ছাত্ররা খুব মজা পায়। আনন্দে তারা হাততালি দেয়।

ছাত্রদের তালি দেওয়া দেখে প্রধান শিক্ষক ধমকে ওঠেন, হাততালির কি হইল ? এইটা তোমরা কিসের তামশা দেখছ ? যাও ক্লাসে যাও। যাও বললাম।

ছাত্ররা দৌড়ে ক্লাসে ঢুকে যায়। শওকত বলে, এতদিন বিদেশে থেকে তোর তো কোনো পরিবর্তন হয় নাই। তুই দেখি আগের মতোই আছিস।

ফরিদ বলে, আমি আগের মতোই আছি না পরের মতো আছি এই বিবেচনা হবে পরে। তুই ক্লাসে যা। ক্লাসে শেষ করে আয়।

শওকত বলে, তুই বাড়িতে যা বিশ্রাম কর। আমি ক্লাসে শেষ করে আসছি।

ফরিদ বলে, আমি তোকে সঙ্গে না নিয়ে বাড়িতে যাব না। আশে পাশে ঘুরঘুর করব। ছবি তুলব। স্কুল ছুটির পর একসঙ্গে বাড়িতে যাব।

ফরিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শওকত ক্লাসে ঢোকে। ক্লাস রুমে ছাত্রছাত্রীরা কিছুটা অগোছালো হয়ে বসে আছে। শওকত ক্লাসে ঢুকেই ছাত্রছাত্রীদের তার বন্ধুর গল্প শোনায়। তোমরা একটু আগে দেখেছ না, আমি আমার এক বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে ঘুরপাক খাচ্ছি। সে বিদেশে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য গেছে। আমি আমার জীবনে তার মতো মেধাবী ছাত্র দেখি নাই। সে এসএসসিতে ফার্স্ট হয়েছে। এইচএসসিতে ফার্স্ট হয়েছে। বিএসসি অনার্স ও এমএসসিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে। আমি তাকে একদিন স্কুলে নিয়ে আসব। তার সঙ্গে কথা বললে তোমাদের খুব ভাল লাগবে। একজন ছাত্র জিজ্ঞেস করে স্যার ওনার নাম কী ? শওকত বলে, তার নাম ফরিদুর রেজা। আমরা ক্লাসে তাকে ডাকতাম আইনস্টাইন, এখন তোমরা বলতো দেখি আইনস্টাইন কে ?

হঠাৎ এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে ছাত্ররা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, উত্তরটা তাদের জানা নেই। শওকত আবার জিজ্ঞেস করে, আইনস্টাইনের নাম শোনো নাই ? একজন ছাত্র বলে, শুনেছি, আপনার বন্ধু। শওকত হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে। তারপর বলে, আরে না না। আইনস্টাইন হলেন একজন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী। আরেকদিন তোমাদের আইনস্টাইন সম্পর্কে বলব। সে দিনের মতো ক্লাস শেষ করে শওকত বেরিয়ে আসে।

বিপুল আয়োজন নিয়ে পুকুর ঘাটে মাছ মারতে বসেছেন আমিন সাহেব। শীতল পাটি বিছিয়ে বেশ আয়েশ করে বসেছেন। মাথার উপরে চাঁদোয়া। পানি, পান আছে, চা আছে। আর আছে ইয়াকুব। তার হাতে পাখা, সে হাওয়া করছে। মুখে একটা পান পুরতে পুরতে আমিন সাহেব ইয়াকুবকে বলেন যূথীকে ডেকে আনতে। ইয়াকুব ওঠে যাবে এমন সময় আবার বলেন, আধার কি দিয়েছ বুঝলাম না, এখন পর্যন্ত মাছ একটা ঠোকরও দিল না!

ইয়াকুব বলে, যূথী আফা আসলে মাছে ঠোকর দিব।

আমিন সাহেব বলেন, তোমরার এইসব কথাবার্তা কিছু বুঝি না। যূথী আসলে মাছে

ঠোকর দিব কী জন্য ? সে কী মাছের রাশি ?

ইয়াকুব বলে, যূথী আফা আসার সাথে সাথে যদি বড় মাছ একটা না ধরেন তাইলে আমার দুই কান কাইট্টা পানিতে ফালাইয়া দিব।

আমিন সাহেব বলেন, কান কাটবা কী দিয়া ? এক কাজ কর। যূথীর সাথে একটা ক্ষুরও আনবা। মাছ ধরা না পড়লে ক্ষুর দিয়া তোমার কান কাটব।

ইয়াকুব চলে যায় যূথীকে ডাকতে। কিছুক্ষণ পর যূথীকে সাথে নিয়ে ফিরে আসে। যূথী বাবার পাশে বসে। একটু দূরে বসে ইয়াকুব।

মেয়ের উদ্দেশ্যে আমিন সাহেব বলেন, তোকে ডাকছি কী জন্য জানিস ?

যূথী বলে, না।

আমিন সাহেব বলেন, সবার ধারণা তোর নাকি মাছ রাশি। বড়শি ফেলার পর তুই আশেপাশে থাকলে বড় মাছ ধরা পড়বে। কথা সত্য কি না পরীক্ষার জন্য তোকে ডাকছি। তুই বসে থাক।

যূথী বলে, কতক্ষণ বসে থাকব ?

আমিন সাহেব পুনরায় বলেন, এক ঘণ্টা। এক ঘণ্টার মধ্যে যদি মাছ ধরা না পড়ে তাহলে ইয়াকুবের কান কাটা হইব। ইয়াকুব ক্ষুর আনছ ?

এই প্রশ্নের কোন উত্তর দেয় না ইয়াকুব। মাথা নিচু করে বসে থাকে।

মেয়েকে উদ্দেশ্য করে আমিন সাহেব আবার বলেন, মা গো তোমার মনটা কি খারাপ ?

যূথী বলে, না।

আমিন সাহেব বলেন, বিবাহ ঠিক করার পর থেকে দেখতেছি তোমার মুখে হাসি নাই। বিয়াতে কি তোমার মত নাই ?

আমিন সাহেবের এই প্রশ্নের কোন উত্তর দেয় না যূথী। এরই মধ্যে বড়শিতে মাছ লেগেছে। হঠাৎ বিরাট উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ইয়াকুব দ্রুত নেমে পড়ে পানিতে। আমিন সাহেব বিশাল একটা রুই মাছ টেনে তোলেন। যূথীর দিকে তাকিয়ে হেসে বলেন তোর তো দেখি সত্যিই মাছ রাশি!

শওকতের বাড়ির উঠানে বসে চাঁদের ছবি তোলার আয়োজন করছে ফরিদ। মাটিতে পাটি পাতা হয়েছে, ট্রাইপডে ক্যামেরা বাঁধা হয়েছে। আমেরিকায় এনসেল এডামের একটা ফটোগ্রাফি একজিবিশন দেখে ফরিদের মাথায় ফটোগ্রাফির শখ চাপে। সে ঠিক করে বাংলাদেশের শত শত ছবি তুলবে। তারপর ছবির একটা প্রদর্শনী করবে। নাম দেবে Green Fairy Land Bangladesh। তাই শওকতের উঠানে চাঁদের ছবি তোলার আয়োজন। এ যেন বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ঐ!

যূথীর বিয়ের দিন ঘনিয়ে আসে। মেয়ের বিয়েতে গান বাজনা হবে না তাই কি হয়? আমিন সাহেব তাই গ্রামীণ গাতক মোবারককে খবর দিয়ে আনেন। উঠানে বসে কথা হয় গাতকের সাথে। আমিন সাহেব গাতককে গান ধরতে বলেন। গলা পরীক্ষা করতে চান। মোবারক গান ধরে,
আমরার যূথী রানীর বিয়ে হবে
ভবে কত আনন্দ।
নেই কোন সন্দ
ও মনা নাই তো কোন সন্দ
ভবে কত আনন্দ।
গান শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় আমিন সাহেবের। তিনি ধমক দিয়ে ওঠেন, চুপ কর। ভবে কত আনন্দ। গলার তো বারটা বাজাইছ। সুর নাই। যাও তোমারে দিয়া গান হবে না। ধমক খেয়ে কিছু বুঝতে পারে না মোবারক। সে বোকার মতো প্রশ্ন করে, চলে যাব?
আমিন সাহেব বলেন, অবশ্যই চলে যাবে। ফাজিল, বলে ভবে কত আনন্দ।
দুঃখী দুঃখী চেহারা করে মোবারক চলে যায়।

মোবারকের চেয়ে অধিক দুঃখী চেহারা নিয়ে আসে যূথী। সে তার বাবাকে বলে, বাপজান আপনে মানুষের সাথে এত খারাপ ব্যবহার করেন কেন? এইগুলা করবেন না, আমার ভাল লাগে না। মেয়ের কথায় আমিন সাহেবের মন ভিজে ওঠে। তিনি ইয়াকুবকে ডেকে নির্দেশ দেন, মোবারক যেন তার বাদ্যযন্ত্র ও দলবল নিয়ে আসে। আজ সারারাত গান হবে। যূথী গান শুনবে।
রাতে মোবারক তার দলবল নিয়ে হাজির হয় আমিন সাহেবের বাড়ি। দলবল বাজনা বাজায় আর মোবারক মহানন্দে গান গায়,
আমরার যূথী রানীর বিয়ে হবে
ভবে কত আনন্দ।
নেই কোন সন্দ
ও মনা নাই তো কোন সন্দ
ভবে কত আনন্দ।

নিজের ঘরে বসে এই গান শোনে যূথী আর মনে মনে হাসে।

জোছনার ফুল

তিন

অসম্ভব বিরক্তি নিয়ে দোতলার বারান্দায় বসে আছেন হোসেন সাহেব। তার হাতে খবরের কাগজ। হোসেন সাহেবের বয়স ষাট কি পঁয়ষট্টি হবে। ছেলে ফরিদ, মেয়ে নীলা ও স্ত্রী সুলতানাকে নিয়ে হোসেন সাহেবের সংসার। এ ছাড়াও বাড়িতে থাকে এগার-বার বছরের কাজের ছেলে জিতু মিয়া ও সাত-আট বছরের কাজের মেয়ে সালমা। হোসেন সাহেব চশমা খুঁজে পাচ্ছেন না। চশমার অভাবে খবরের কাগজ পড়া হচ্ছে না। নীলা ছাড়া বাসার সবাই হুলস্থুল করে চশমা খুঁজছে। হোসেন সাহেব নীলাকে বলেন, তুই একটু চশমাটা খুঁজলে তো পারিস। নীলা বলে, বাবা একটা কাজ করা যায়, তুমি বরং পত্রিকাটা আমাকে দাও। আমি পড়ি তুমি শোন। মেয়ের এমন প্রস্তাবে হোসেন সাহেবের মেজাজ আরো খারাপ হয়ে যায়। তিনি নীলাকে সামনে থেকে চলে যেতে বলেন।

নীলা চলে যাবার পর কি মনে করে যেন হোসেন সাহেব পাঞ্জাবির পকেটে হাত দেন। পকেটে হাত দিয়েই তিনি সামান্য বিব্রত বোধ করেন। চশমাটা পকেটেই পেয়ে যান। তিনি চশমা চোখে দিয়ে খবরের কাগজ পড়তে থাকেন।
এদিকে নীলার মা সুলতানা কাজের ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে 'ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না এলাইহে রাজেউন' পড়তে পড়তে ঘর ওলট পালট করে চশমা খুঁজছেন।
হোসেন সাহেব একমনে খবরের কাগজ পড়ে যাচ্ছেন। নীলা এসে সামনে দাঁড়ায়। নীলা তার বাবাকে জিজ্ঞেস করে, চশমা পেয়েছ ?
হুঁ ?
তোমার পাঞ্জাবির পকেটে ছিল ?
হুঁ।
সবাই এখনো খুঁজে বেড়াচ্ছে, তাদের ডেকে বলবে না, চশমা পাওয়া গেছে ?
শুধু শুধু চিৎকার করিস নাতো।
বাবা, তুমি যে খুব উদ্ভট একটা মানুষ এটা কী তুমি জানো ?
না, জানি না।
পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্ভট মানুষ হচ্ছে ভাইয়া, তুমি হলে রানার আপ।
ফরিদকে উদ্ভট বলছিস কি জন্য, আমার তো মনে হয় সে খুবই Rational ছেলে।
তোমার Rational ছেলে একদিন থাকবে বলে বন্ধুর বাড়ি গিয়েছে, আজ সপ্তম দিন এখনো ফিরছে না। কে জানে কি করছে ?

প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ফরিদ বসেছে। শওকতও আছে সেখানে। আর আছে প্রধান শিক্ষক আবদুর রহমান সাহেব। ফরিদ ছেলেমেয়েদের ম্যাজিক দেখাচ্ছে। একটা কাঁচের গ্লাস ভর্তি করে পানি নেয় ফরিদ। তার ওপর একটা কাগজ দেয়। গ্লাসটাকে উল্টো করে ধরে। পানি পড়ে যাবার কথা। কিন্তু পানি পড়ে না। আনন্দে বিস্ময়ে ছেলেমেয়েরা হাততালি দিয়ে ওঠে। গ্লাসের পানি কেন পড়ে না ফরিদ তার ব্যাখ্যা দেয়, পানি পড়ছে না কারণ বাতাস নিচ থেকে চাপ দেয়। বায়ুর যে চাপ আছে এই ম্যাজিক হলো তার প্রমাণ, ছাত্রছাত্রীরা মজা পায়, আব্বারো হাততালি দেয়। ম্যাজিক দেখানো শেষ করে ফরিদ। ছাত্রছাত্রীদের জোড়-বিজোড় শেখায়। সে জিজ্ঞেস করেন ৪ কী জোড় না বিজোড় ? ছাত্রছাত্রীরা বলে জোড়। ৭ জোড় না বিজোড় ? ছাত্রছাত্রীরা বলে বিজোড়। এবার সে উঠে গিয়ে বোর্ডে শূন্য লেখে। এবার জিজ্ঞেস করে, শূন্য জোড় না বিজোড় ? ছাত্রছাত্রীরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। শওকত ও প্রধান শিক্ষকও মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন। ফরিদ বলে শূন্য হলো বিজোড় সংখ্যা। ছাত্রছাত্রীরা আবার হাততালি দেয়।

ইয়াকুবকে সাথে নিয়ে আমিন সাহেব তার বাড়ির উঠানে লম্বা একটা বাঁশ পুঁতেছেন। বাঁশের মাথায় লাল নিশান। আমিন সাহেব ইয়াকুবকে জিজ্ঞেস করে, লাল নিশান কেন উড়ালাম জানো ? ইয়াকুব বলে, না। আমিন সাহেব ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বলেন, যারা যারা এই নিশান দেখবে তারারই দাওয়াত। আমি জনে জনে গিয়া দাওয়াত করতে পারব না। নিশান দিয়া দাওয়াত দিলাম। ইয়াকুব মনে মনে বলে বুদ্ধি ভাল বাইর করছেন। নিশান টানাইয়া দাওয়াত।

আমিন সাহেবের টানানো নিশান গ্রামের যে কোনো জায়গা থেকে দেখা যায়। কুদ্দুসের চায়ের দোকান থেকেও দেখা যায়। ফরিদ এসেছে চায়ের দোকানে চা খেতে। কুদ্দুস নিশান দেখিয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বলে। ফরিদ খুব মজা পায়। সে কুদ্দুসকে বলে। আমিন সাহেব তো খুব ইন্টারেস্টিং মানুষ। তার মেয়ের বিয়েতে সে যাবে।

আমিন সাহেবের নিশান উড়িয়ে দাওয়াত দেওয়াকে হেড মাস্টার আবদুর রহমান মোটেই ভালভাবে নিতে পারেননি। তিনি মনে করছেন আমিন সাহেব গ্রামের সকলের গালে চপেটাঘাত করেছেন। বিষয়টা নিয়ে আবদুর রহমান স্ত্রী জুলেখার সাথেও আলোচনা করে। জুলেখা তার মাথাটা আরো বিগড়ে দেয়। সে বলে, আমিন সাহেব নিশ্চয়ই গ্রামের বিশিষ্টজনদের নিজ মুখে দাওয়াত দিয়েছেন। রহমান সাহেব যেহেতু বিশিষ্ট জনদের মধ্যে পড়ে না তাই তাঁকে দাওয়াত দেননি। স্ত্রীর কথাগুলো প্রধান শিক্ষকের মনে হূলের মতো বিঁধে। তিনি শওকতের খোঁজে বের হন।

শওকত আর ফরিদ গেছে জঙ্গলে। ফরিদ শুকনো পাতা আর ডাল দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে

আগুন জ্বেলেছে। আগুনের সামনে বসে সে কবিতা আবৃত্তি করছে,

এইখানে বনের কাছে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি।
সারারাত দখিনা বাতাসে
আকাশের চাঁদের আলোয়
এক ঘাই হরিণীর ডাক শুনি
কাহারে সে ডাকে ?

শওকত ফরিদকে চা এগিয়ে দেয়। চায়ে এক চুমুক দিয়ে ফরিদ আবার কবিতা আবৃত্তি করে।

কোথাও হরিণ আজ হতেছে শিকার
বনের ভেতরে আজ শিকারিরা আসিয়াছে
আমিও তাদের ঘ্রাণ পাই যেন,

হঠাৎ জঙ্গলের ভেতরে শুকনো পাতায় পায়ের শব্দ শোনা যায়। শব্দ পেয়ে ফরিদের কবিতা থেমে যায়। দেখা যায় প্রধান শিক্ষক আবদুর রহমান সাহেব আসছেন।

আবদুর রহমান সাহেব শওকতকে আড়ালে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করে আমিন সাহেব তাকে নিজ মুখে বিয়ের দাওয়াত দিয়েছেন কি না ? শওকত বলে, দাওয়াত সে পেয়েছে। শওকতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রহমান সাহেব ছোটেন ইমাম সাহেবের বাড়ি।

এতরাতে রহমান সাহেবকে দেখে ইমাম সাহেব খুব অবাক হন। রহমান সাহেব ইমাম সাহেবের কাছ থেকেও একই বিষয় জানতে চান। ইমাম সাহেবও গা জ্বালা জবাব দেন, জ্বি করেছেন। উনি নিজ মুখে দাওয়াত করেছেন। মানুষটার দিল বড় আছে। মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে বিরাট আয়োজন করেছেন। জামাইকে আনতে স্টেশনে ব্যান্ডপার্টি যাবে। সেই ব্যান্ডপার্টি আসছে ঢাকা থাইক্যা। আবদুর রহমান নিজ গালে একটা থাপ্পড় অনুভব করেন, ভাল ভাল বাদ্য-বাজনা হওয়া ভাল বলে ইমাম সাহেবের বাড়ি থেকে বিদায় নেন।

গ্রামের বিশিষ্ট কিছু লোকজন, ব্যান্ডপার্টি ও হাতি নিয়ে আমিন সাহেব স্টেশনে অপেক্ষা করছেন। ব্যান্ড বেজে চলছে। তীব্র হুইসেল দিয়ে ট্রেন এসে থামে। আবার ছেড়ে যায়। জামাই আসে না। বাদ্য-বাজনা বেজেই চলে। জামাই আনতে যে গিয়েছে সে ট্রেন থেকে নেমে দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে আমিন সাহেবের সামনে আসে। আমিন সাহেব জিজ্ঞেস করেন, জামাই কই ?

আসে নাই।

পরের ট্রেনে আসবো ?

না আসবে না।

তুমি কী বলতেছ!

আমিন সাহেব থ হয়ে যান। একজন হাত ইশারা করে। বাদ্য-বাজনা থেমে যায়। ভীষণ রকম মন খারাপ হয় আমিন সাহেবের।

এদিকে আমিন সাহেবের বাড়িতে বধূর সাজে বসে আছে যূথী। তাকে ঘিরে আছে গ্রামের মেয়েরা। বিয়ের গান হচ্ছে। একজন এসে যূথীর কানে কানে একটা কিছু বলে। সাথে সাথে গান থেমে যায়।

স্টেশন থেকে হাতি ও ব্যান্ডপার্টি ফিরে আসে। আসার পথে কারো মুখে কোনো শব্দ নেই। শুধু হাতির গলায় ঘণ্টা বাজছে টুন টুন টুন।

জোছনার ফুল

চার

ফরিদ আজ ঠিক করে সারাদিন জঙ্গলে ঘুরবে। ঘু ঘু শিকার দেখবে। ক্যামেরা, ট্রাইপড আর ফ্লাক্সে চা নিয়ে সে জঙ্গলের দিকে যায়। জঙ্গলে গিয়ে ট্রাইপডে ক্যামেরা বাঁধে। ঘুঘু শিকারি মজিদ খাঁচার ভেতরে ঘু ঘু নিয়ে বের হচ্ছে। তাকে বের হতে দেখে ডাক দেয় ফরিদ। মজিদের নাম ভুলে যায় ফরিদ। তাই ঘুঘু ভাই বলে ডাকে। ফরিদের ডাক শুনে মজিদ ফিরে দাঁড়ায়। ফরিদ তার ছবি তোলে, ঘুঘু ভাই ডাক শুনে মজিদ কিছুটা অবাক হয়। এই নামে তাকে কেন ডাকা হলো জানতে চাইলে ফরিদ বলে, ঘুঘু নিয়ে আপনার কারবার। এই জন্য ডেকেছি ঘুঘু ভাই, নাম ভুলে গেছি। মজিদ তার নাম বলে। ফরিদ আর ভুলব না এই আশ্বাস দিয়ে মজিদকে চা খেতে বলে। এবারও মজিদ বিস্মিত হয়। জঙ্গলের মধ্যে চা পাবে কোথায়! ফরিদ তাকে আশ্বস্ত করে যে, ফ্লাক্সে চা এনেছে। দু'জনে চা খায়। চা খেতে খেতে ফরিদ বলে, আজ সারাদিন জঙ্গলে কাটাবো। মজিদের কাছে মনে হয় ফরিদ খুব ভাল মানুষ। ভাল মানুষ সহজে চেনা যায়। খারাপ মানুষকে চিনতে সময় লাগে। ফরিদ মজিদের কথা জানতে চায়, বিয়ে করেছে কি না। ছেলে মেয়ে কয়জন এইসব। মজিদ জানায় তার এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলেকে ডাকে জঙ্গল আলী বলে আর মেয়ের নাম পাখি। ছেলেটা ছোট বেলা থেকেই বাবার মতো জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরে তাই তার নাম জঙ্গল আলী।

মজিদের বাড়িতে তার ছেলে মেয়ে ও স্ত্রী রাহেলা বেগম ছাড়াও আছে বৃদ্ধা মা আসগরী বেগম ও চব্বিশ/পঁচিশ বছরের বোন শরিফা। শরিফা গর্ভবতী। তার স্বামী

থাকে বিদেশে। মজিদ যখন জঙ্গলে ফরিদের সাথে চা খাচ্ছে তখন তার বাড়িতে ছেলে জঙ্গল আলী গুলতি বানাচ্ছে। জঙ্গলকে গুলতি বানাতে দেখে তার মা রাহেলা খুব রাগ করে এবং তাকে স্কুলে যেতে বলে। জঙ্গল স্কুলে যাবে না বলে জানালে রাহেলা বেগম ছেলেকে ধমক দেয়। বৌয়ের উঁচু গলা শুনে ঘরের ভেতর থেকে শাশুড়ি আসগরী বেগম রাহেলাকে ডাক দেয়।

শাশুড়ির ডাক শুনে রাহেলা বেগম শাশুড়ির কাছে যায়। আসগরী বেগম জঙ্গলকে স্কুলে যাবার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করতে নিষেধ করে। শাশুড়ির কথা রাহেলার পছন্দ হয় না। সে শাশুড়িকে বলে, আম্মা শুনেন, আপনে জানেন আমি আপনের সব কথা শুনি, স্কুল নিয়ে আপনে যে কথা বললেন, এইটা আমি শুনব না। পড়াশোনা ছাড়া আমরার গতি নাই। এই বলেই রাহেলা শাশুড়ির সামনে থেকে উঠানে যায়।

উঠানে নেমে রাহেলা দেখে জঙ্গল নেই। সে জঙ্গলের নাম ধরে ডাকাডাকি করে কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ পায় না।

পুকুর ঘাট থেকে ভেজা কাপড়ে আসছে শরিফা। শরিফা বলে জঙ্গলকে সে দেখেছে দৌড়ে বাড়ির বাইরের দিকে যেতে। শরিফার হাতে পানি ভর্তি বালতি দেখে রাহেলা শরিফাকে ভর্ৎসনা করে। বলে, তোমারে না বলছি ভারী জিনিস নাড়াচাড়া করবা না। তোমারে পানি আনতে কে বলেছে ? এই কাজ আর কোনদিন করবা না। তোমার জামাই বিদেশে। তোমার ভালমন্দ দেখার দায়িত্ব আমরার। কী বলতেছি মন দিয়া শুনতেছ ? শরিফা জবাব দেয়, হুঁ।

মজিদের মেয়ে পাখি স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়। এমন সময় তার দাদি আসগরী বেগম তাকে ডাকে। বলে, আজ স্কুলে যাওয়ার দরকার নাই। মেয়েছেলেদের এত লেখাপড়া শিখে কী হবে। আয় তোকে একটা গল্প বলি। পাখি দাদীর কাছে বসে। দাদী গল্প বলা শুরু করে এমন সময় শরিফা এসে দাদির কবল থেকে পাখিকে উদ্ধার করে।

যূথী তাদের পুকুর ঘাটে বসে বই পড়ছে। হঠাৎ তার চোখে পড়ে একটা ছেলে কী যেন নিয়ে যাচ্ছে। সে ভাল করে তাকায়। দেখে জঙ্গল আলী একটা কাঠির মাথায় মরা একটা পাখি নিয়ে যাচ্ছে। যূথী জঙ্গলকে ডাকে। জঙ্গল কাছে আসে, যূথী তার সাথে কথা বলে। পাখি কে মেরেছে। সে স্কুলে যায়নি কেন ? জিজ্ঞেস করে। স্কুলের কথা আসতেই জঙ্গল দৌড়ে পালিয়ে যায়।

জঙ্গলের ব্যাপারে তার মা রাহেলা বেগম খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। মজিদ বাড়িতে এলে সে ছেলের স্কুল কামাইয়ের কথা জানায়। মজিদ তার ছেলেকে বোঝায়। বলে, বাপধন মন দিয়া শোনো, একটা সময় ছিল স্কুল কলেজ কিছু ছিল না। লেখাপড়া শিখতে হইলে দূর

দেশে যাইতে হইত। জায়গির থাইক্যা পড়তে হইত। কত কষ্ট। আর আইজ ঘরের কাছে স্কুল। সেই স্কুলে তুমি যাও না। কেন যাও না বাপধন ? জঙ্গল আলী কোনো জবাব দেয় না। চুপ করে থাকে। মজিদ আবার বলে, তুমি স্কুলে যাও না শুইন্যা মনে বড় কষ্ট পাইছি। পড়াশোনা যে কি জিনিস এখন বুঝবা না। বড় হইয়া বুঝবা। তখন বুইঝ্যা কোনো কিছু করার পারবা না। ছেলের গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে মজিদ গুনগুন করে নিজের বাঁধা গান গাইতে শুরু করে,

স্কুলে যাও না শুইন্যা মনে কষ্ট পাই।
এই কষ্টের কথা আমি কাহারে জানাই।
বুকে জ্বলে কষ্টের আগুন
চোখে আসে জল।
কে আমারে শান্ত করবে
তুই আমারে বল।

উঠানের এক কোণে চুলা জ্বালিয়ে শরিফা রান্না করতে বসে। মজিদের স্ত্রী রাহেলা একটা সিদ্ধ ডিমের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে শরিফার কাছে এসে বসে। ডিমটা শরিফাকে খেতে দেয়। শরিফা বলে, ভাবী তুমি কী শুরু করছ ?

রাহেলা বলে, এত অবাক হইতেছ কেন ? পোয়াতির যত্ন করব না ? তোমার যত্ন করা মানে যে সন্তান আসতেছে তার যত্ন করা। যত্ন বিনা সন্তান ভাল হয় ? তোমার ভাইরে বইল্যা কাল থেইক্যা দুধের ব্যবস্থা করব। লজ্জায় শরিফা লাল হয়ে ওঠে।

পুকুরের ঘাটে বসে যূথী বই পড়ছে। চোখ মুছছে। হঠাৎ কোথা থেকে ফরিদ এসে হাজির। তাকে দেখে যূথী থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়ায়। ফরিদ নিজের পরিচয় দিয়ে বলে, আজ সন্ধ্যায় আমি চলে যাচ্ছি। আমি একটা অপরাধ করেছি। অপরাধটা আপনাকে নিয়ে। যাবার আগে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে এসেছি।

যূথী জিজ্ঞেস করে, কী অপরাধ ?

আপনি গল্পের বই পড়ার সময় এই বাঁধানো ঘাটে এসে বসেন। বই পড়তে পড়তে কাঁদেন। আড়াল থেকে এই দৃশ্যটা আমি প্রায়ই দেখতাম। এই আমার অপরাধ। ফরিদ আবার বলে,

নির্জন পুকুর ঘাটে ঘুঘু ডাকছে। এক তরুণী ঝিমধরা দুপুরে বই পড়তে পড়তে চোখের জল ফেলছে। কী অপূর্ব দৃশ্য। আমি যাই আপনি ভাল থাকবেন।

ফরিদ লম্বা পা ফেলে চলে যাচ্ছে। তার চলে যাওয়ার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে যূথী।

পাঁচ

আমিন সাহেব বাড়ির পেছনে ইজি চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর কোলের ওপর একটা প্যাকেট। প্যাকেটটা ঢাকা থেকে ফরিদ নামের একজন পাঠিয়েছে যূথীকে। প্যাকেটের ভেতর কী আছে তা তিনি জানেন না। যূথীর সাথে ফরিদের যোগাযোগ হলো কীভাবে- এইসব বিষয় নিয়ে তিনি চিন্তিত। চিন্তিত মুখ নিয়েই আমিন সাহেব ইয়াকুবকে ডাকেন। যূথী কোথায় আছে খোঁজখবর নেন। কোলের ওপর রাখা প্যাকেটটা ইয়াকুবকে দিয়ে বলেন যূথীকে দিয়ে দিতে।

প্যাকেট নিতে এসে ইয়াকুব ফরিদ এবং ফরিদের পাঠানো প্যাকেট নিয়ে একটা বক্তৃতা সেরে ফেলে। ইয়াকুব প্যাকেট নিয়ে পুকুর ঘাটের দিকে যায়। যূথী সেখানেই আছে। আমিন সাহেব চিন্তিত মুখে বসে থাকেন।

ইয়াকুব প্যাকেটটা নিয়ে যূথীকে দেয়। যূথী প্যাকেট খুলে দেখে ভেতর ৫-৬টা ছবি। সবগুলো ছবি তার। ছবিগুলো সুন্দর হয়েছে। সে মুগ্ধ হয়ে ছবিগুলো দেখে।

কুদ্দুসের চায়ের দোকানের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে শওকত। কুদ্দুস তাকে ডেকে নিয়ে চা খাওয়ায়। ঢাকা থেকে শওকতের বন্ধু ফরিদ যে কুদ্দুস ও তার মেয়ে রীনার ছবি পাঠিয়েছে, কুদ্দুস আগ্রহ নিয়ে শওকতকে তা দেখায়। ছবি দেখে শওকত খুব মুগ্ধ হয়। কুদ্দুস শওকতের কাছে রীনার পড়ালেখার খোঁজখবর করে। কুদ্দুস বলে, আমার মেয়েটা লেখাপড়া কেমন করতেছে ?

ভাল করতেছে। শান্ত, মেয়ের বুদ্ধি খুব বেশি। স্মরণশক্তি ভাল।

শওকতের মুখে মেয়ের প্রশংসা শুনে কুদ্দুস খুব খুশি হয়।

বাপ বেটা মিলে ক্ষেতে কাজ করছে। বাপের মেজাজটা ভাল থাকলেও বেটার মেজাজটা ভাল ঠেকছে না। বাপ যা-ই জিজ্ঞেস করে ছেলে তারই জবাবে বলে, জানি না। বাবা ছেলেকে জিজ্ঞেস করে, বাপধন কও দেখি সব কাজের বড় কাজ কী ?

জানি না।

কৃষি কাজ। এই কাজের ওপর কোনো কাজ নাই। কও দেখি কেন ?

জানি না।

যা জিজ্ঞাসা করি তুমি বল জানি না, তোমার কী কোনো কারণে মন মিজাজ খারাপ বাপধন ?

জানি না।

আমার ওপর কী তুমি নারাজ ?

জানি না।

এক সময় শওকত এসে চাষীকে সালাম দিয়ে বলে শওকত তাকে খুঁজছে। শওকত বলে, লোক মুখে শুনেছি আপনে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ছেলেরে আর স্কুলে দিবেন না, এইটা কি সত্য ? চাষী এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয় না। শওকত তাকে বোঝায় যে তার ছেলে পড়াশোনায় খুবই ভাল। ক্লাস ফাইভের বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পাবে। তার পড়ালেখা বন্ধ করে দেওয়া ঠিক না। চাষী জানায় ক্ষেতের সব কাজ সে একা করে উঠতে পারে না তাই...। শওকত তাকে বলে তার যখন সমস্যা হবে সে যেন শওকতকে খবর দেয়। শওকত এসে তাকে কাজে সাহায্য করবে। শওকত ছেলের হাত থেকে নিড়ানি নিয়ে ক্ষেতে নিড়ানি দিতে থাকে। শওকতের কাণ্ড দেখে চাষী হতভম্ব হয়ে যায়। সে বলে, আমি ছেলেরে স্কুলে পাঠাব। মাস্টার সাব আপনে কাম বন্ধ করেন।
চাষীর কথা শুনে শওকত খুশি মনে সেখান থেকে বিদায় হয়।

আমিন সাহেব গেছেন তার হাতির খোঁজখবর নিতে। হাতির সামনে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। একের পর এক কলা গাছ আসছে। হাতি খেয়ে ফেলছে। তিনি জানতে চান সে কয়টা কলাগাছ খায়। ইয়াকুব জানায় সকালের নাস্তা হিসাবে চার-পাঁচটা খায়। মেজাজ ভাল থাকলে বেশিও খায়। হাতির খাওয়া দেখে আমিন সাহেবের নিজের মেজাজই খারাপ হয়ে যায়। তিনি হাতি বিক্রি করার জোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলেন।

হাতির খোঁজখবর নিয়ে আমিন সাহেব যান মেয়ের খোঁজ নিতে। যূথী যথারীতি পুকুর ঘাটে বসে বই পড়ছে। তার পাশে ছবিগুলো রাখা। আমিন সাহেব মেয়ের পাশে বসেন। টুকটাক ভালমন্দ দু'চার কথার পর আমিন সাহেব মেয়ের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করেন ফরিদের সাথে তার সম্পর্কটা কতদূর। বাবার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে যূথী একটু বিরক্ত হয়। সে বলে, বাবা তুমি বেশি যন্ত্রণা কর। খামাখা লেবু কচলাও। মেয়ের কাছ থেকে মৃদু ধমক খেয়ে আমিন সাহেব চিন্তিত মুখে উঠে যান।

ফরিদের ঘরে ফরিদ বড় একটা বাঁধানো ছবি দেয়ালে টানাচ্ছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটা মেয়ে পুকুর ঘাটে পা ডুবিয়ে বসে একটা ভেড়ার বাচ্চাকে গোসল করিয়ে দিচ্ছে। ফরিদের বোন নীলা এসে তার ঘরে ঢোকে। তার হাতে মিষ্টির প্যাকেট। সে ছবি দেখে অবাক। মেয়েরা নাকি তাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনেক কিছু দেখতে পায়। নীলাও তার ব্যতিক্রম নয়। সেও দু'একটা খোঁচা মেরে ফরিদকে বাজিয়ে নেয়। তারপর বলে মিষ্টি খেতে। কিসের মিষ্টি জানতে চাইলে চাকরির মিষ্টি জানালেও কী চাকরি তা নীলা বলে না। উল্টো বলে, কী চাকরি বলা যাবে না। বললে তোমরা আওলায়ে যেতে পার। মিষ্টি খেতে খেতে ছবির দিকে তাকিয়ে থাকো। মুখে মিষ্টি। ছবিতে মিষ্টি।

নীলা তার বাবা হোসেন সাহেবকেও মিষ্টি খাওয়াতে যায়। তাকে ফরিদের ছবি টানানোর ব্যাপারটা বলে। শুনে হোসেন সাহেব মহা খুশি। তিনি ধারণা করেন তার ছেলে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। তারই সিগনাল হিসেবে পছন্দের মেয়ের ছবি ঘরে টানিয়ে রেখেছে।
হোসেন সাহেব দৌড়ে ছেলের ঘরে যান। ফরিদ তার ডায়রিতে কী যেন লিখছে। বাবাকে ঘরে ঢুকতে দেখে সে খুব অবাক হয়। ঘরে ঢুকে হোসেন সাহেব মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেয়ালে টানানো ছবির দিকে তাকিয়ে আছে।
হোসেন সাহেব মেয়েটির নাম জিজ্ঞেস করেন। ফরিদ জানায় যূথী। হোসেন সাহেব খুব খুশি হন নাম শুনে। ফরিদের মাও এসে ঘরে ঢোকেন। তাঁর পেছন পেছন আসে বাসার কাজের ছেলেমেয়ে দু'টি। সবাই এসে মুগ্ধ হয়ে ছবি দেখে।

মজিদের ছেলে জঙ্গল আলী তার মায়ের সাথে রাগ করে জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে আছে। তাকে খুঁজতে জঙ্গলে যায় মজিদ। খবরটা শওকতের কানে আসে। এদিকে আমিন সাহেব তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সে আমিন সাহেবের সাথে দেখা করতে যায়। কি জন্য আমিন সাহেব শওকতকে ডেকেছেন তা তিনি ভুলে যান। শেষে তাকে তার সাথে খেয়ে যেতে বলেন। শওকত আপত্তি করে না। তবে সে জঙ্গল আলীকে খুঁজে এসে খাবে বলে জানায়। আমিন সাহেব খুব বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, এতবড় জঙ্গলে তারে কোথায় খুঁজবা ? শওকত বলে সে কোথায় লুকিয়ে থাকে তা আমি জানি। এমন সময় যূথী এসে ঢোকে। সে বলে, শওকত ভাই তার সব ছাত্রছাত্রীর সব খবর জানে।

আমিন সাহেব খুব খুশি ও অবাক হন। তিনি বলেন, বলে কী! তোমার এই গুণের কথাতো জানতাম না। মানুষের সব দোষ প্রকাশিত হয়। গুণ চাপা পইড়া থাকে, এইটা একটা আপসোস। যাও তোমার ছাত্ররে খুঁইজ্যা বাইর কইরা আন, আমার সঙ্গে খানা খাও।

জঙ্গল আলীকে ঠিক তার জায়গাটিতেই পাওয়া গেল। তাকে সঙ্গে নিয়ে শওকত ও মজিদ ফেরে। মজিদ জঙ্গল আলীকে কিছু বলার জন্য শওকতকে অনুরোধ করে। শওকত বলে পরে বলবে। মজিদ নিজে বলতে চায়। শওকত বলে, শক্ত করে না, মিষ্টি করে বলতে হবে। শক্ত কথা অন্তরে ঢোকে না। মিষ্টি কথা ঢোকে। মজিদ গুনগুন করে গান ধরে,
আমার একটা পুত্র ছিল
জঙ্গল আলী নাম।
বাপ-মারে কষ্ট দেওয়া

সেই ছেলের কাম।
ছেলে আমার গুণের ছেলে গুণের সীমা নাই।
মধ্যরাতে ছেলেরে আমি জঙ্গলার ভিতর পাই।
মজা পেয়ে শওকত গানে ধুয়া ধরে, আহা বেশ বেশ বেশ
জঙ্গল আলীও বলে, আহা বেশ বেশ বেশ।

জোছনার ফুল

ছয়

প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রী ফুলি। তার মা আমিনা ও বাবা গফুর পড়াশোনার গুরুত্ব বোঝে না। ফুলির পড়ালেখার প্রতি খুব আগ্রহ। সন্ধ্যা হলেই সে পড়তে বসে। আজও ফুলি পড়তে বসবে, দেখে তার মা হারিকেন জ্বালিয়ে রান্না করছে। ফুলি মাকে বলে, মা পড়তে বসব। হারিকেনটা নেই ? ঝাঁঝের সাথে আমিনা বলে, হারিকেন নিলে আমি রাঁধব কেমনে ? আমি কি আন্ধাইরে চউখে দেখি ?

ফুলি বলে, স্কুলে অনেক পড়া দিছে মা। হাতের কাজও আছে।

আমারটা কি পায়ের কাজ ? খালি ত্যক্ত করে। যা কুপি খুঁইজ্যা বাইর কর। ফুলি কুপি খুঁজতে চলে যায়। আমিনা বিরক্ত মুখে রান্না করতে থাকে।

কুপি খুঁজে বের করে ফুলি। জ্বালিয়ে চৌকির ওপর পড়তে বসে। এমন সময় ফুলির বাবা গফুর এসে ঘরে ঢোকে। ফুলিকে কিছু না বলে সে কুপি নিয়ে চলে যায়। বাবার এমন আচরণে ফুলি খুবই অবাক হয়। গফুর কুপি নিয়ে বারান্দায় দড়ি পাকাতে বসে। বিস্মিত ফুলি গফুরের পেছন পেছন এসে বই খাতা নিয়ে পুনরায় বারান্দায় বসে। ফুলি জোরে জোরে পড়তে থাকে।

“আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।”

ফুলির পড়ার শব্দে গফুর খুবই বিরক্ত হয়। সে ধমক দিয়ে বলে, গলাত মাইক লইয়া চিল্লাইতেছস কী জন্য ? আবুর ঘুম ভাঙ্গলে উপায় আছে ? আস্তে পড়। বাবার কথায় ফুলি নিঃশব্দে পড়তে থাকে। এমন সময় সত্যি সত্যি আবুর ঘুম ভেঙে যায়। সে ঘরের মধ্যে চিৎকার করে কান্না জুড়ে দেয়। রান্না ঘর থেকে আমিনা চেঁচিয়ে বলে, ফুলি আবুরে ধর। ফুলি পড়া ছেড়ে উঠে গিয়ে আবুকে কোলে নেয়। আবুকে নিয়ে ফুলি উঠানে হাঁটে। ভাইয়ের পিঠে থাবা দিয়ে দিয়ে ছড়া বলে আর হাঁটে,

আবু ঘুমায়রে
ময়না ঘুমায়রে
কাক পক্ষী কা কা করে
চোখে নিদ নাই।
আমার কোলে ঘুমাইয়া থাকে
মহারাজার সিপাই।
আবু ঘুমায়রে
ময়না ঘুমায়রে

পরদিন স্কুলে যাবার পর শওকত পড়া ধরে। যারা হাতের কাজ আনেনি তাদের উঠে দাঁড়াতে বলে। চারটা মেয়ে ও একটা ছেলে উঠে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে ফুলি একজন। শওকত ফুলিকে জিজ্ঞেস করে সে কেন হাতের কাজ আনেনি। ফুলি কিছু বলে না। তার চোখ বেয়ে পানি পড়ে। শওকত সবাইকে বসতে বলে। সবাই বসে। কেবল ফুলির চোখে পানি গড়াতে থাকে।

স্কুল ছুটির পর প্রধান শিক্ষক আবদুর রহমান ও শওকত বাড়ির পথে রওয়ানা হয়। হাঁটতে হাঁটতে আবদুর রহমান শওকতকে বলেন, শোনো শওকত। মাথা গরম করবা না তোমার ছাত্রছাত্রীরা বাড়িতে পড়তে পারে কী পারে না এইটা তাদের বিষয়। এইটা তোমার কোনো বিষয় না। তোমার বিষয় স্কুলে পড়ানো। স্কুলে পড়িয়ে দিলে গেল ফুরাইয়া। প্রধান শিক্ষকের কথায় শওকত খুবই অবাক হয়। সে বলে, ফুরাইয়া গেল! প্রধান শিক্ষক, অবশ্যই ফুরাইয়া গেল। বেতন কয় পয়সা পাও ? অল্প কয়টা পয়সার জন্য অতো চিন্তা পোষায় না। শওকত বলে, আপনার কথায় অবাক হচ্ছি। বাড়িতে তাদের পড়াশোনার পরিবেশ নাই। সে বিষয়ে আমরা চিন্তা করব না ?

প্রধান শিক্ষক বলেন, বাস্তব কথা বলি। বাস্তব কথায় অবাক হইতে চাইলে হও, যাই বাড়ির দিকে যাই। বলে প্রধান শিক্ষক হন হন করে হাঁটা ধরেন। শওকত হা করে তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে।

বাড়িতে এসেও প্রধান শিক্ষকের মাথা থেকে চিন্তাটা যায় না। তিনি স্ত্রী জুলেখার সাথে আলাপটা তোলেন। বলেন, কিছু কিছু মানুষ মাথার মধ্যে পোকা নিয়ে জন্মায়। এই পোকার কাজ হইল কামড়ানি।

জুলেখা জিজ্ঞেস করে, কার কথা কন ?

প্রধান শিক্ষক বলেন, কার আবার ? আমরার শওকত মাস্টার।

জুলেখা বলে, সে আবার নতুন কী করছে।

প্রধান শিক্ষক বলেন, ছাত্রছাত্রীর বাড়িতে পড়ার পরিবেশ নাই। এই নিয়ে চিন্তা। মিটিং

মিছিল করবে, গানের আসর করবে।
প্রধান শিক্ষকের কথায় জুলেখা হাসে, সে বোঝানোর চেষ্টা করে শওকত যা করছে ভাল করছে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা সবার সন্তান, তাদের ভালমন্দ দেখার দায়িত্ব সবার। বিশেষ করে স্কুলের শিক্ষকদের। তার নিজেরও এই উদ্যোগের সাথে থাকা দরকার।
আবদুর রহমান স্ত্রীর ওপর খুবই বিরক্ত হন। তিনি জুলেখাকে বলেন, তোমার মাথার মধ্যেও পোকা আছে। তোমার সাথে এই আলাপ তুইলাই ভুল হইছে। প্যাক প্যাক কইরা হাসবা না।

মেয়ের বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর আমিন সাহেব খুব মন মরা হয়ে পড়েছিলেন। তবে এখন তার মন খুব ভাল। মেয়ের বিয়ে আবার ঠিক হয়েছে। চিঠি এসেছে। সাথে হবু জামাইয়ের ফটোও এসেছে। ইয়াকুবকে ডেকে তিনি সুসংবাদটা জানান। আমিন সাহেব বিশ্বাস করেন দুঃসংবাদ যখন আসে তখন একসাথে ৩টা করে আসে। আর সুসংবাদ আসে জোড়ায় জোড়ায়। একটা সুসংবাদ এসেছে। আরেকটা কী হবে তা তিনি ভেবে পাচ্ছেন না। ইয়াকুব বলে, হয়ত হাতি কেনার লোক পাওয়া যাবে। আমিন সাহেব ধমকে ওঠেন, রাখ তোমার হাতি বিক্রি। স্টেশন থেকে জামাই আনতে হবে না?
হাতির প্রসঙ্গ আসায় আমিন সাহেবের হাতির পিঠে চড়ে ঘোরার কথা মনে হয়, ইয়াকুবকে নির্দেশ দেন ব্যবস্থা করতে। আর বলেন লুকিয়ে যূথীর টেবিলে হবু জামাইয়ের ফটো রেখে আসতে।
আমিন সাহেবের নির্দেশমতো ইয়াকুব যূথীর টেবিলে ছবি রেখে আসে। হাতি চড়ার সমস্ত ব্যবস্থা করে।

নিজের টেবিলে সুদর্শন যুবকের ছবি পেয়ে যূথী খুবই অবাক। সে ভেবে পায় না এই ছবি কোথা থেকে এলো। ইয়াকুবকে ডেকে জিজ্ঞেস করে। ইয়াকুব বলে, জ্বি না আফা, আমি ছবি পাবো কই! দেখি কার ছবি? ইনার চেহারা তো সুন্দর আফা।
ইয়াকুবের কথায় যূথীর সন্দেহ হয়। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইয়াকুবকে পরখ করতে থাকে। মনে মনে ভাবে বাবা আবার তার বিয়ের ফন্দি আঁটছে। আটুক এবারও একই ফল হবে।

শওকত ছেলেমেয়েদের বাড়িতে পড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য গানের আসরের ব্যবস্থা করে। এর প্রচারের জন্য গ্রামে পোস্টার লাগায়। হাতিতে চড়ে বেড়াতে বেরিয়ে আমিন সাহেব বড় গাছের গায়ে সেই পোস্টার দেখতে পায়। তাতে লেখা, রাত ৯টায় মনু বয়াতির গানের আসর।
গানের আসরে গ্রামের সবাই উপস্থিত। গান শুরু হওয়ার আগে শওকত সংক্ষিপ্ত বক্তব্য

রাখে, আজকের গানের আসর উদ্দেশ্যমূলক- আমি মনু বয়াতিকে দিয়ে একটা গান বাঁধিয়েছি। গানের মাধ্যমে কিছু কথা আপনাদের বলতে চাই। সন্তানকে স্কুলে পাঠায়েই আপনারা মনে করেন সব দায়িত্ব শেষ। এটা ঠিক না। ছেলেমেয়েদের তো বাড়িতেও পড়াশোনা করতে হবে। সেই ব্যবস্থা, সেই সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে না ? পড়াশোনার জন্য জায়গা লাগবে। রাতে তার একটা হারিকেন লাগবে। লাগবে না ? একজন গ্রামবাসী শওকতের কথায় সমর্থন জানায়। সাথে সাথে শুরু হয় গান,

ভুল বলে নাই কথা
ভুল বলে নাই।
বাড়িতে লেখাপড়ার জন্য
পরিবেশ চাই।

শওকত আবার কথা বলেন। মেয়ে সন্তানের জন্যও কথাটা সত্য। সংসারের নানান কাজ তাকে করতে হয়। সে পড়বে কখন। মাকে রান্নায় সাহায্য কর, বাসন ধুয়ে নিয়ে আস, ছোট ভাইবোনেরে কোলে নাও। একজন বৃদ্ধ সমর্থন জানায়, মাস্টারতো কথা ভুল বলে নাই।

মনু বয়াতির কণ্ঠ জেগে ওঠে আবার, ভুল বলে নাই কথা/ভুল বলে নাই/মেয়ে সন্তানের দুঃখের কথা আমি বইল্যা যাই।

আসর ভাঙতে ভাঙতে মধ্যরাত গড়ায়।

গ্রামের সব বাড়িতে ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার সমস্যা একইরকম। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সমস্যা বেশি। ঘুঘু শিকারি মজিদের বাড়িতে একই দৃশ্য দেখা যায়। মজিদের মেয়ে পাখি পড়তে বসে। সাথে তার ভাই জঙ্গলও বসে আছে। রান্নাঘর থেকে পাখির মা তাকে চাল বেছে দেওয়ার জন্য ডাকে। পাখি পড়া ছেড়ে উঠে যায়। রান্না ঘরে গিয়ে পাখি চাল বেছে দিয়ে আবার এসে পড়তে বসে। এমন সময় পাখির দাদি ওকে ডেকে নিয়ে যায় মাথায় তেল দিয়ে দেওয়ার জন্য। পাখি দাদির মাথায় তেল দিতে শুরু করে। অন্য ঘর থেকে ব্যাপারটা খেয়াল করে মজিদের বোন শরিফা। সে এসে মাকে বলে, মেয়ে পড়তে বসেছে তাকে কেন ডাকতিছেন। মেয়ের কথায় আসগরী বেগমের গলা খনখনিয়ে ওঠে। আমার মাথায় তেলটা দেবে কে ? এই বাড়িতে কী দশটা দাসীবান্দী আছে ? শরিফা পাখিকে পড়তে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেই আসগরী বেগমের মাথায় তেল মাখতে বসে। আর বলে, পুলাপানরে খালি স্কুলে পাঠাইলেই হয় না। পড়াশোনার ব্যবস্থাও কইরা দিতে হয়। আসগরী বেগম আবার খনখন করে ওঠে, বলে, নিজের বাচ্চা হউক, তারে মাথায় নিয়ে ঘুরিস। মায়ের কথায় শরিফা লজ্জাও পায় আবার তার খুব রাগও হয়।

রাতে খাওয়া দাওয়া শেষে মজিদ ও তার স্ত্রী রাহেলা শুতে যায়। শুয়ে শুয়ে মজিদ

আজকের গানের আসরের কথা সবিস্তারে রাহেলাকে বলে। মজিদ বলে, শিশুর যত্ন মায়ের পেট থেকে করতে হয়। আমাগো শরিফা তো এখন পোয়াতি। ওর আদর যত্ন করবা। সে যেন সব সময় আনন্দ ফূর্তিতে থাকে সেই দিকে খেয়াল রাখবা। বলতে বলতে মজিদ নিজের মনেই গুনগুনিয়ে ওঠে,

ভুল বলে নাই কথা
ভুল বলে নাই
মার গর্ভে থাকতেই শিশুর যত্ন হওয়া চাই।

মজিদের গান শুনে রাহেলা খুব খুশি হয়ে ওঠে। সে মজিদকে প্রেমের গান গাওয়ার জন্য অনুনয় করে। মজিদ আবার গান ধরে,

প্রেমের মরা জলে ডুবে না
ও প্রেম করতে দুই দিন
ভাঙতে একদিন এমন প্রেম আর
কইর না গো দরদী

মজিদের গান শুনে আসগরী বেগম ঘুম থেকে জেগে ওঠে। তার খনখনে গলা বেজে ওঠে ধমকের সুরে, ঐ মজিদ রাইত দুপুরে কী শুরু করছিস ? আমরারে ঘুমাইতে দিবি না ? চিৎকার করলেই গান হয় ? গলাত সুরের বংশ নাই। ধরছে গান।

আসগরী বেগমের কথায় মজিদ ও রাহেলা হেসে ওঠে।

সাত

আমিন সাহেবের পুকুরে মাছ কিলবিল করে। বড়শি ফেললেই মাছ ওঠে। অনেকেই এই পুকুরে বড়শি ফেলে মাছ ধরে নিয়ে যায়। আমিন সাহেব প্রায়ই বেশ আয়োজন করে বড়শি ফেলে মাছের প্রতীক্ষায় থাকেন। কিন্তু মাছ ওঠে না। বিষয়টা নিয়ে তিনি খুবই চিন্তিত। পুকুরে বড়শি ফেললে ইয়াকুব সব সময় পাশে থাকে। আজও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। আমিন সাহেব বিষয়টি নিয়ে ইয়াকুবের সাথে আলোচনা করে। এক পর্যায়ে আমিন সাহেব তার সিদ্ধান্তের কথা জানায় ইয়াকুবকে যে, আজ তিনি মাছ মারবেন। সেই মাছ রান্না হবে তারপর ভাত খাবেন। যদি মাছ ধরা না পড়ে তা হলে পেঁয়াজ আর কাঁচা মরিচ দিয়ে ভাত খাবেন। সিদ্ধান্ত জানার পর ইয়াকুব খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে। আমিন সাহেব এক কথার মানুষ। যদি মাছ ধরা না পড়ে। এমন সময় বড়শিতে টান পড়ে। আমিন সাহেব ছিপ তোলেন। কিন্তু হায় বড়শিতে কোনো মাছ

নেই। আবার বড়শি ফেলে আমিন সাহেব গভীর মনোযোগ দিয়ে ফাৎনার দিকে তাকিয়ে আছেন। এমন সময় শওকত আসে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির মিটিং এর কথা বলতে। আমিন সাহেব ইশারায় তাকে কথা বলতে নিষেধ করেন। সাথে সাথে ইয়াকুবও একই রকম ভঙ্গি করে। শওকত আবার কথা বলে ওঠে, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সভা, আপনার উপস্থিত থাকা বিশেষ প্রয়োজন। আমিন সাহেব আবারো ইশারায় তাকে কথা বলতে বারণ করেন এবং চলে যেতে বলেন। ইয়াকুবও আমিন সাহেবের মতো ইশারায় চলে যেতে বলে। শওকত কিছু বুঝতে না পেরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে যায়।
দুপুর গড়িয়ে যায়। মাছের দেখা নেই। ইয়াকুব আমিন সাহেবকে আজকের মতো ক্ষান্ত দিতে অনুরোধ করে। আমিন সাহেব ইশারায় ইয়াকুবকে চুপ থাকতে বলে। মনে হয় বড়শিতে মাছ ঠোকরাচ্ছে। তিনি বড়শি তোলেন। কিন্তু যেই কপাল সেই মাথা। কিছু নেই। আমিন সাহেব বিড় বিড় করতে থাকেন।

আমিন সাহেবের সাথে কথা বলতে না পেরে শওকত যায় মওলানা সাহেবের বাড়ি। মওলানা সাহেব টিউবওয়েল থেকে পানি তুলে ওজু করছেন। শওকত সালাম দিয়ে দাঁড়ায়। সালামের উত্তর দিয়ে মওলানা সাহেব তাকে বলেন, কী জন্য এসেছ বুঝেছি। আমার মনে আছে, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির মিটিং। মনে কইরা দিতে হবে না। এই মিটিং-এ আমি সব সময় উপস্থিত থাকি। অনেকে যে মিটিং-এ উপস্থিত থাকে না, মিটিং-এর কথায় বিরক্ত হয়, শওকত সে কথা মওলানা সাহেবকে বলে। মওলানা সাহেব জুম্মাবারে ঐ বিষয়ে মসজিদে আলোচনা করবেন বলে শওকতকে আশ্বস্ত করেন। ধন্যবাদ জানিয়ে শওকত মওলানা সাহেবের বাড়ি থেকে বিদায় হয়।

জলচৌকিতে বেশ আয়েশ করে বসে পায়ে আলতা লাগাচ্ছে যূথী। গুনগুন করে গান গাইছে সে,
উঠলো কন্যা বাঁধলো চুল
পায়ে আলতা দিয়া
পিঁড়িতে বসিল কন্যা
লাজে রাঙা হইয়া।
এমন সময় কাজের মেয়ে রাবেয়া বড় গ্লাস ভর্তি করে বেলের শরবত এনে যূথীর সামনে রাখে। রাবেয়া খুব আগ্রহ নিয়ে যূথীকে জিজ্ঞেস করে তার বিবাহের তারিখ ঠিক হয়েছে কি না। যূথী ঝটপট জবাব দেয়, আশ্বিন মাসের ৭ তারিখ শুক্রবার।
রাবেয়া বলে, ‘আলহামদুলিল্লাহ্’।
‘আলহামদুলিল্লাহ্’ বলার দরকার নাই, বিবাহ হবে না।

বিবাহ হবে না ? আপনে কী কন! বিবাহ হবে না কী জন্য ?

আগেরবার বিবাহ ঠিক হয়েছিল। জামাই পালিয়ে গেল। এইবার ঠিকঠাক হবে বউ পালিয়ে যাবে। রাবেয়া শোনো, বেলের শরবত নিয়ে যাও আমি খাব না।

আমিন সাহেবের বাড়ির সামনে দিয়ে বেদের দল যাচ্ছে। তারা ডাক দিচ্ছে, সাপের খেইল দেখবেন। সাপের খেইল। যূথী রাবেয়াকে বলে বেদেনীদের ডাক দিতে। সে সাপের খেলা দেখবে।

বেদেনীরা এসে সাপের খেলা দেখানো শুরু করছে। যূথী মুগ্ধ হয়ে সাপের খেলা দেখছে। যূথীর বিবাহ ঠিক হয়েছে তাই বেদেনীরা তার কাছ থেকে বকশিস চায় এবং ঝাঁপি খুলে কাল নাগিনী দেখায়। এই কাল নাগিনীই লখিন্দরকে দংশন করেছিল। যূথী বেদেনীদের খুশি করে দেয়। তারা চলে যায়।

মওলানা সাহেবের বাড়ি ঘুরে শওকত আবার আমিন সাহেবের বাড়িতে আসে। এসেই যূথীকে ডাকে। শওকতের ডাক শুনে যূথীর ভেতর আনন্দের এক হিল্লোল খেলে যায়। সে আনন্দ আর কারো সাথে ভাগ করা যায় না। এ একান্তই নিজস্ব। ঘর থেকে বের হয়ে যূথী আনন্দিত কণ্ঠে বলে তার বাবা পুকুরে মাছ ধরছে। শওকত তাকে জানায় সে তার বাবার কাছে আসেনি। এসেছে তার কাছে। এই কথা শুনে যূথীর ভেতরটা আরো উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, খুব অবাক হয়। কেননা শওকত কখনোই যূথীর কাছে আসে না। আসে তার বাবার কাছে। ভেতরের সমস্ত আবেগ চাপা দিয়ে যূথী বলে, আপনি আমার কাছে আসেন না বাপজানের কাছে আসেন। আপনি কী শুনেছেন আমার আবার বিবাহ ঠিক হয়েছে ?

শওকত বলে, শুনেছি। চাচাজি ছবিও দেখায়েছেন। ছেলে ডাক্তার।

যূথী বলে, আমার কপাল খুব ভাল। দু'দিন পরে পরে বিবাহ ঠিক হবে। শেষ সময়ে ভেঙেও যাবে। এটাও ভাঙবে। এই বলে যূথী চোরা চোখে শওকতের দিকে তাকায় আর মুখ টিপে হাসে।

শওকত জিজ্ঞেস করে, হাসছ কেন ? যূথী হাসি থামিয়ে বলে, এখন বলেন কী জন্যে আসছেন। শওকত বলে, তুমি চাচাজিকে বুঝিয়ে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির মিটিং এ পাঠাবে। উনার উপস্থিতিটা খুবই দরকার।

যূথী বলে, বলেছিলাম না, আপনি আমার কাছে আসেন নাই। বাপজানের কাছে আসছেন। কথা ঠিক হয়েছে ? শওকত চুপ করে থাকে। যূথী আবার বলে, আপনি চিন্তা করবেন না, বাপজান যাবে। আমি তাকে পাঠাবো। শওকত বিদায় নিতে চাইলে যূথী বলে, অসম্ভব। বেলের শরবত খেয়ে যাইতে হবে। আসেন ঘরে আসেন। বেলের শরবত খেলে ত্বক ভাল হয়। যূথী শওকতকে নিয়ে ঘরে ঢোকে। শওকত শরবত খায়। যূথী এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। খাওয়া শেষ হলে শওকত জিজ্ঞেস করে,

যূথী আমার বন্ধু ফরিদকে কী তোমার পছন্দ ?
এই প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না যূথী। যূথীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শওকত বাড়ির পথ ধরে।

রাতে আমিন সাহেব খেতে বসেন। তার সামনে অনেক রকম খাবার সাজানো। এত খাবার দেখে তিনি রেগে যান। এক কথার মানুষ। মাছ ধরতে পারেননি। তাই পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচ দিয়ে ভাত খাবেন। অন্য সব কিছু নিয়ে যেতে বলেন। যূথী তার পাতে মুরগীর মাংস তুলে দিয়ে বলে, মাছ ধরতে পার নাই, মাছ খাবে না। মুরগীর তরকারিতে তো অসুবিধা নাই।
মেয়ের কথায় আমিন সাহেবের রাগ পড়ে যায়। তিনি তৃপ্তির সাথে খেতে থাকেন। সুযোগ বুঝে যূথী স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভার কথা বলে। যূথী আমিন সাহেবের কাছ থেকে কথা আদায় করে যে, তিনি স্কুল ম্যানেজিং কমিটির মিটিং-এ যাবেন এবং স্কুল যেন ভাল হয় সে রকম সিদ্ধান্ত নেবেন ও কাজ করবেন।

স্কুল বিষয়ে যূথীর পরামর্শ আমিন সাহেবের মধ্যে আফিমের মতো কাজ করছে। ম্যানেজিং কমিটির সভায় তাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। চলতি সময়ে কী কী সমস্যার আবর্তে স্কুল চলছে তা চিহ্নিত করার প্রতি জোর দেন। শওকত একে একে সমস্যাগুলো বলে যায়, প্রধান সমস্যা ছাত্রছাত্রীরা ঠিকমত স্কুলে আসে না। বাবা-মা-রা তাদের স্কুলে পাঠানোর প্রতি গুরুত্ব দেয় না। স্কুল বিল্ডিং ঠিক করা প্রয়োজন। একে আকর্ষণীয় করতে হবে। স্কুল যে আনন্দের জায়গা তা ছাত্রছাত্রীদের কাছে তুলে ধরতে হবে। বাচ্চারা নিয়মিত স্কুলে না আসার এটাও একটা কারণ।
সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করা হবে। ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের সাথে কথা বলা হবে। কাজটা শুরু হবে জুম্মাবারে মসজিদ থেকে। মওলানা সাহেব মসজিদে বিষয়টা তুলবেন।

স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মওলানা সাহেব প্রস্তুত ছিলেন জুম্মাবারের জন্য। নামাজ শেষ হতেই তিনি উঠে দাঁড়ান এবং বলেন, আপনারা কী দুইটা মিনিট সময় দেবেন ? কিছু কথা বলবো।
সবাই বসলো, মাওলানা সাহেব আবার বলতে শুরু করেন, আমাদের নবীজীর একটা হাদিস আছে, শিক্ষার জন্য প্রয়োজনে চীন দেশে যাও। এই মুহূর্তে চীন দেশে যাওয়ার দরকার নাই। এখন আমাদের নিজেদের গ্রামে নিজেদের এলাকায় একটা স্কুল আছে, সেই স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত যায় না। অভিভাবক-শিক্ষকদের মিটিং-এ অভিভাবকরা যেতে চান না। এটা কী ঠিক ? এমন সময় স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুর রহমান সাহেব

উঠে দাঁড়ান। তিনি বলেন, আপনারা যখন ক্ষেতে ধানের চারা লাগান, চারা লাগানোর পরে কী ঘরে বসে থাকেন ? খোঁজ-খবর করেন না ? সার দেন, পানি দেন, ক্ষেতে গরু-ছাগল ঢোকে কি না দেখেন। স্কুলে ছাত্র দিয়ে ঘরে বসে থাকবেন ? খোঁজ খবর নেবেন না ?

হেড মাস্টারের কথা শুনে মুসল্লীদের মধ্যে একজন ওঠে দাঁড়ায় এবং বলে অবশ্যই খোঁজখবর নেওয়া দরকার। মুসল্লীর কথা শুনে প্রধান শিক্ষক খুব খুশি হন এবং বলেন শুনে খুশি হলাম। 'আলহামদুলিল্লাহ্'। আগামী নয় তারিখ অভিভাবক-শিক্ষক সভা কথাটা মনে রাখবেন।

প্রধান শিক্ষক সাহেবের কথা শেষ হতেই মওলানা সাহেব মুনাজাত ধরেন। মুনাজাত শেষে সবাই একে একে মসজিদ থেকে বের হয়ে আসে।

আট

ফরিদ ও. নীলা এসেছে শওকতদের গ্রামে। স্টেশন থেকে নেমে তারা মহিষের গাড়ি ভাড়া করে। ফরিদের কাঁধে যথারীতি ক্যামেরা ঝুলছে। গাড়িতে বসে নীলা যূথীকে কেন্দ্র করে ভাই ফরিদকে নানা রকম টিপ্পনি কাটে। গাড়ির গাড়োয়ান সেগুলো শোনে এবং বেশ মজা পায়। কিছুদূর থেকে দেখা যায় কিছু ছেলেমেয়ে দল বেঁধে স্কুলে যাচ্ছে। নীলা ফরিদকে অনুরোধ করে তাদের একটা ছবি তুলতে। ফরিদ ক্লিক ক্লিক করে ছবি তোলে। নীলাদের গাড়োয়ান খুব স্মার্ট। হঠাৎ সে বলে, সবেই স্কুলে যেতে চায় না আফা। চাইর আনি পুলাপান স্কুলে যায় না। আমার নিজেরটাও যায় না। চড়-থাপ্পড় দিয়ে দেখছি। চাইর আনি কথাটা নীলা বুঝতে পারে না। ফরিদ তাকে বুঝিয়ে দেয়। চাইর আনি হলো ২৫%। ষোল আনায় এক টাকা হয়। যেতে যেতে তারা গ্রামের উঠানে দেখতে পায় একজন মা তার ছেলেকে স্কুলে যেতে বলছে। কিন্তু ছেলে কিছুতেই স্কুলে যাবে না। তার স্কুলে যেতে ভাল লাগে না।

গ্রামের নানা দৃশ্য দেখতে দেখতে ফরিদ আর নীলা শওকতদের বাড়ি পৌঁছে যায়। শওকতের খালা খুব আনন্দের সাথে তাদের গ্রহণ করে। খাওয়া দাওয়া শেষে ফরিদ বেরিয়ে পড়ে ক্যামেরা নিয়ে। আর নীলা প্রতীক্ষায় থাকে শওকতের।

শওকত স্কুল থেকে ফিরছে। দেখে এক তরুণী শহুরে মেয়ে শিমুল গাছের ফুলের দিকে তাকিয়ে আছে। মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টি। শওকত এগিয়ে যায় এবং বলে, তুমি নীলা না ?

নীলা বলে, আমি নীলা হতে যাব কোন্ দুঃখে ? নীলার কথায় শওকত খুবই অপ্রস্তুত

হয়ে যায়। শওকতের অবস্থা দেখে নীলা হেসে ফেলে এবং শওকতের স্মৃতিশক্তির প্রশংসা করে।

শওকত আর নীলা ফরিদকে খুঁজতে বের হয়। কিছু দূর যেতেই একটা ছেলেকে দেখে শওকত থমকে দাঁড়ায়। ছেলেটাকে বলে, এই তুমি আজ স্কুলে আস নাই কেন ? তুমি ফজলু ভাইয়ের ছেলে না ? গতকালও তো স্কুলে আস নাই। ব্যাপারটা কী ? ছেলেটা সব কথায়ই হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ে। হঠাৎ নীলা বলে ওঠে, আপনি কী এখন তাকে শাস্তি দেবেন ? ভাইয়া ঠিকই বলেছে। আপনার মাথায় স্কুল ছাড়া কিছু ঘোরে না। সারাক্ষণ স্কুল স্কুল স্কুল।
শওকত বলে, ছাত্রছাত্রীরা যখন স্কুল কামাই করে তখন খুব খারাপ লাগে।
কেন কামাই করে সেটা জানেন ?
জানার চেষ্টা করছি।
আচ্ছা যান স্কুল কেন কামাই করে সে কারণগুলো বের করার ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করবো। In return আপনি আমাকে যূথীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন।
কার সঙ্গে ?
যূথী নামের একটি মেয়ের সঙ্গে। এই গ্রামে থাকে। আমার ধারণা ভাইয়া এই মেয়েটির প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

গ্রামটা একটা চক্কর দিয়ে ফরিদ চায়ের দোকানে এসে চায় খায় আর কুদ্দুসের সাথে নানা রকম কথাবার্তা বলে। আগের বার এসে ফরিদ কুদ্দুস ও তার মেয়ের ছবি তুলেছে। তা পাঠিয়েছে। কুদ্দুস সেটা বাঁধিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে। ফরিদকে আগ্রহ নিয়ে সেটা দেখায় সে। এক সময় কুদ্দুস ফরিদকে বলে, লোকমুখে শুনতেছি আমরার শওকত স্যারের বিবাহ । ফরিদ বলে, কই আমি কিছু জানি না তো!
কুদ্দুস আবার বলে, আপনার বইনের সঙ্গে বিবাহ, এই রকম রটনা। রটনার জন্য তো জায়গাটা ভাল। ভাইজান কিছু মনে নিয়েন না, ফরিদ কুদ্দুসকে আশ্বস্ত করে যে, সে কিছু মনে নেয় নাই।

যূথীর মাথায় তেল দিতে দিতে কাজের মেয়ে রাবেয়া ফরিদ ও নীলার গ্রামে আসার খবরটা দেয়। রাবেয়া প্রথমে ভেবেছিল মেয়েটা ফরিদের স্ত্রী। পরে জানতে পারে বোন। তার ধারণা বোনকে শওকতের সাথে বিবাহ দেওয়ার জন্যই ফরিদ তাকে নিয়ে এসেছে। কথাটা শুনে যূথী খুব বিরক্ত হয়। সে মানুষের বদনাম না করার জন্য রাবেয়াকে হুঁশিয়ার করে দেয়। রাবেয়া দমবার পাত্রী নয় মোটেই। সে বলে, বদনাম ভাইব্যা কিছু বলি নাই। আফাগো মাফ কইরা দেন। তয় একটা কথা আফা, শওকত

ভাইয়ের সাথে ইনার যদি ভাব-ভালবাসা না হয় আমি কান কাইট্যা গাঙ্গের পানিতে ফালাইয়া দিব।
রাবেয়ার কথায় যূথী কিছুটা বিরক্ত ও বিচলিত হয়।

শওকত ও ফরিদ তাদের বাড়ির উঠানে বসে গল্প করছে। নীলা এক প্লেট কাটা পেঁপে এনে সামনে রেখে তাদের খেতে বলে। ফরিদ পেঁপে না খেয়ে ভাত খাবার কথা বলে। নীলা জানায় ভাত হতে দেরি আছে। তাছাড়া খালা বলেছে এই পেঁপে ল্যাংড়া আমের চেয়ে মিষ্টি। তাই এটা খেতে হবে। এই বলে নীলা খালার কাছে চলে যায়। সে খালার কাছে রান্না শিখছিল। শওকত আর ফরিদের আলাপের মধ্যে আবার স্কুল চলে আসে। ফরিদ বলে আসলেই কী তোর মাথায় সারাক্ষণ স্কুল ঘোরে ? শওকত বলে, অনেক বাচ্চাকে দেখি স্কুলে আসতে চায় না। এটা নিয়ে খুব চিন্তার মধ্যে আছি।
ফরিদ- স্কুলে মজা পায় না বলে যেতে চায় না। আমি বিদেশে স্কুলগুলো দেখেছি, ওদের কর্মকাণ্ড এরকম যে, বাচ্চারা স্কুলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে থাকে। আমাদের দেশে স্কুল মানে শুধুই পড়া আর পড়া। তাহলে হবে না। স্কুলে নানান কর্মকাণ্ড থাকবে। Art and craft, গান বাজনা, সাংস্কৃতিক উৎসব- বুঝতে পারছিস কী বলছি। স্কুলের কর্মকাণ্ডে ছাত্রছাত্রীদের যুক্ত করবি। By rotation class captain বানাবি। স্কুলে ফুলের বাগান করবি। By rotation বাগানের in-charge বানাবি।
শওকত বলে, তোর কথাগুলো পছন্দ হচ্ছে। দেখি কী করা যায়। আমি ঠিক করেছি যে সব ছেলেমেয়ে স্কুলে আসতে চায় না, তাদের সাথে কথা বলব।
ফরিদ বলে, তুই জিজ্ঞেস করলে হবে না। তুই স্কুলের শিক্ষক। তোকে সত্যি কথাটা হয়ত বলবে না। বাইরের কেউ জিজ্ঞেস করুক। নীলা জিজ্ঞেস করতে পারে। শওকত বলে, এটা মন্দ হয় না। গুড আইডিয়া।
ফরিদ আর শওকতের পরিকল্পনা অনুযায়ী নীলা মাঠে নেমে পড়ে। সে ছেলেমেয়েদের সাথে কথা বলে। একটা ছেলের কাছ থেকে সে জানতে পারে পড়া না পারলে স্যারেরা বকা দেয়। তাই স্কুলে যেতে চায় না। কথাটা শুনে নীলা ভাবে সরকার তো সার্কুলারের মাধ্যমে মানসিক ও শারীরিক শাস্তি রোধ করেছে। তবু এমন হয়। ছেলেটা আরো জানায় প্রতিদিন পড়া পারলে সে স্কুলে যেত। অনেক চেষ্টা করেও নীলা একটা মেয়ের কাছ থেকে কিছুই জানতে পারে না। সবশেষে মেয়েটি কেবল বলে, লইজ্যা লাগে।

স্কুলকে আনন্দময় করে তোলার ব্যাপারটা নিয়ে শওকত প্রধান শিক্ষক সাহেবের সাথে আলাপ করে। শওকতের কথা শুনে প্রধান শিক্ষক তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন। তিনি বলেন, তুমি এইসব কী বলতেছ ? স্কুল কী নাট্যশালা নাকি ? আনন্দ-ফূর্তি হবে। স্কুল হলো বিদ্যাপীঠ। এখানে শুধু বিদ্যা অর্জন। আর কিছু না।

শওকত বলে, স্কুল স্কুলই থাকবে। বিদ্যা অর্জনই হবে। তবে বিদ্যা অর্জনটা হবে আনন্দের সঙ্গে।
প্রধান শিক্ষক বলেন, আচ্ছা পরে ভেবে দেখব।

যূথী পুকুর ঘাটে বসে বই পড়ছে। নীলা এসে উপস্থিত হয়। নীলাকে দেখেই যূথী বলে, তুমি নীলা ?
নীলা বলে, হ্যাঁ। আমি এসেছি তোমাকে দেখতে। আমার ভাই যে মেয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে তাকে দেখতে আসাটা অস্বাভাবিক নয় নিশ্চয়ই!
নীলার কথা শুনে যূথী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।

জোছনার ফুল
নয়

মজিদের ছেলে জঙ্গল আলী পরীক্ষাকে খুব ভয় পায়। পরীক্ষার দিন তারিখ ঠিক হলেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। জঙ্গলের মা মওলানা সাহেবের কাছে আসে তাবিজের জন্য। মওলানা সাহেব তাবিজ দেন না। তাবিজ দিয়ে যে ভয় কাটানো যায় না এই কথা তিনি জঙ্গলের মা রহিমা বেগমকে বুঝিয়ে বলেন। কি করে ছেলের ভয় ভাঙানো যায় সেই বিষয়ে শওকতের সাথে পরামর্শ করার জন্য বলেন।

রাতে জঙ্গলের শরীর খুব খারাপ হয়ে যায়। মজিদ তার মাথায় পানি ঢালে। মাথার ব্যথা কমছে কি না জিজ্ঞেস করে। কিছু খাবে কি না তাও জিজ্ঞেস করে। দুটি কথারই না সূচক জবাব দেয় জঙ্গল। শুধু বলে, অসুখ, পরীক্ষা কেমনে দিমু। মজিদ তাকে পরীক্ষা দেওয়ার চিন্তা মাথা থেকে দূর করতে বলে। সঙ্গে সঙ্গে ছেলে লাফ মেরে ওঠে বলে, বাপজান পরীক্ষা দিমু না ? মজিদ বলে, পরীক্ষা এখনো দেরি আছে। ততদিনে শরীর ঠিক হয়ে যাবে। ইনশাল্লাহ্ তুমি পরীক্ষা দিতে পারবা।

ডাকপিয়ন এসে চিঠি দিয়ে যায়। চিঠি পড়েই আমিন সাহেবের মেজাজ প্রচণ্ড খারাপ হয়ে যায়। যে ডাক্তার ছেলের সাথে যূথীর বিয়ে ঠিক হয়েছে তারা সম্বন্ধ করবে না বলে জানিয়েছে। আমিন সাহেব চিঠি নিয়ে যূথীর ঘরে যান। ব্যাপারটা যূথীকে বলেন। এও বলেন যে, যূথীই চিঠি দিয়ে তাদের সম্বন্ধ ভাঙার কথা বলেছে। যূথী কাজটা ঠিক করেনি। অল্প বিদ্যা ও বেশি বুদ্ধি দু'টিই ভয়ঙ্কর। রাগে দুঃখে তিনি যূথীকে তালা মেরে রাখার সিদ্ধান্ত নেন। এতে যূথীরও কোনো আপত্তি নেই বলে যূথী জানায়। আমিন

সাহেব বিশাল সাইজের একটা তালা এনে যূথীর ঘরে লাগিয়ে দেন। ইয়াকুবকে ডেকে চাবি পুকুরে ফেলে দিতে বলেন। হাতি বিক্রি করার নির্দেশ দেন। হাতি কেনার খরিদ্দার পাওয়া না গেলে জঙ্গলে নিয়ে ছেড়ে দিতে বলেন।

দুপুর নাগাদ আমিন সাহেবের রাগ পড়ে যায়। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে তিনি ইয়াকুবকে যূথীর ঘরের তালা ভাঙার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ পেয়ে ইয়াকুব দাঁত বের করে হাসে আর বলে, তালা ভাঙনের প্রয়োজন নাই চাচাজি। চাবি পুশকুনিতে ফালাই নাই। আমি তো জানি একটু পরেই আপনার রাগ থাকবে না। তালা খোলনের প্রয়োজন পড়ব।

আমিন সাহেব ধমকের সুরে বলেন, হুকুম পালন কর নাই। আবার দাঁত বাইর কইরা হাসতেছ। যাও তালা খোল, ফাজিল। আমার ধারণা যূথীর নিজের পছন্দের কেউ আছে। আমার মনে সন্দেহ হইতেছে। তুমি গোপনে সন্ধান কর।

জ্বি আচ্ছা, বলে ইয়াকুব তালা খুলতে চলে যায়।

মজিদের সাথে দেখা হয় ফরিদের। ভালমন্দ কুশলাদি বিনিময়ের পর মজিদ ছেলের পরীক্ষা-ভীতি নিয়ে ফরিদের সাথে আলাপ করে। ফরিদ তাকে বলে, আপনার ছেলে পরীক্ষা ভয় পায়, তার কারণ অবশ্যই সে নিয়মিত স্কুলে যায় না। যে ছেলে নিয়মিত স্কুলে যাবে, পড়াশোনা ঠিকমত করবে, তার পরীক্ষা-ভীতি থাকার কোনো কারণ নেই। মজিদ ভেবে দেখলো কথাটা সত্য। সাথে সাথে সে বলে, আমার ছোট মেয়েটার পরীক্ষা বিষয়ে কোনো ভয় নেই। সে নিয়মিত স্কুলে যায়। ঘরে পড়াশোনা করে। এখন কথা হইল আমি বুঝতে পারলে তো কাজ হইব না। যার বুঝনের দরকার সে কি বুঝব?

ফরিদ বলে, ভাল কথা বলেছেন, জগতের নিয়ম হলো, যার বোঝা প্রয়োজন সে বুঝে না। বাকি সবাই বোঝে।

মজিদ গুন গুন করে গান ধরে,

‘জগতের জটিল নিয়ম ভাই
যার বুঝনের কথা তার খবর নাই।’

মজিদের গান শুনে ফরিদ খুব উৎসাহিত হয়ে ওঠে। সেও গান ধরে,

‘জগতের জটিল নিয়ম ভাই
যার বুঝনের কথা তার খবর নাই।’

শওকত ও নীলা জঙ্গলদের বাড়ি যায়। শওকত বাড়ির বাইরে অপেক্ষায় থাকে। নীলা ভেতরে যায়। বাড়ির ভেতর গিয়ে নীলা দেখে জঙ্গল আলী বারান্দায় শুয়ে আছে। পাশে তার মা বসে আছে। নীলা গিয়ে পাশে বসে। সে জঙ্গলকে বোঝানোর চেষ্টা করে। নীলা বলে, জঙ্গল আলী তুমি আমার দিকে তাকাও। আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নাই।

আমি তোমার স্কুলের স্যার না। তবে আমি শহরে একটা স্কুলে পড়াই। সেখানে কেউ আমাকে ভয় পায় না।
জঙ্গল বলে, আমি কাউরে ডরাই না।
নীলা বলে, এইতো কথার মতো কথা বলেছ। কাউকে ডরাও না, তাহলে পরীক্ষা ডরাও কেন ? পরীক্ষা ডরাও না ? এই প্রশ্নে জঙ্গল হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ে। নীলা আবার বলে, পরীক্ষা কেন ভয় পাও তুমি জান ? তুমি পরীক্ষা ভয় পাও কারণ তুমি সারাবছর পড়াশোনা কর না। স্কুল ফাঁকি দাও। যখন পরীক্ষা চলে আসে, তখন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। ভয়ে শরীর খারাপ হয়ে যায়। তুমি যদি এখন থেকে নিয়মিত পড়াশোনা কর, স্কুল ফাঁকি দেওয়া বন্ধ কর, তাহলে অবশ্যই ভয় কেটে যাবে। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে তুমি অবশ্যই বুঝতে পারবে। নীলা জঙ্গলদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে।
বাড়ির বাইরে আসতেই শওকত জিজ্ঞেস করে, রুগী কেমন দেখলে ? উত্তরে নীলা বলে, রুগী উঠে বসেছে। শওকত ভাই, শুনুন, আপনাকে যা করতে হবে তা হলো সব ছাত্রদের নিয়ে একটা আলোচনা সভা, সেখানে আপনি পরীক্ষা-ভীতি নিয়ে কথা বলবেন। এক ধরনের ওয়ার্কশপ মানে কর্মশালা।
শওকত বলে, মন্দ না। এই জিনিস কখনো আমার মাথায় আসেনি। তুমি এই কর্মশালার অতিথি বক্তা হিসেবে একটা বক্তৃতা দিও। নীলা বলে, তা দিতে পারি। হাঁটতে হাঁটতে তারা শওকতদের বাড়ি এসে পৌঁছে।

যূথী পুকুর ঘাটে বসে আছে। ফরিদ এসে উপস্থিত হয়। ফরিদ বলে, কেমন আছেন ?
ভাল।
আপনি যখন পুকুর ঘাটে এসে বসেন, তখন আপনার হাতে গল্পের বই থাকে। আজ গল্পের বই নেই কেন ?
আপনি যখন ঘুরে বেড়ান, সব সময় কাঁধে ক্যামেরা থাকে। আজ ক্যামেরা নাই কেন?
ফরিদ বলে, আমি কী কিছুক্ষণ আপনার সাথে গল্প করতে পারি ?
গল্প করতে আমার ভাল লাগে না।
বেশ, গল্প করার দরকার নেই। চুপচাপ বসে থাকতে পারি ? তাতে কী অসুবিধা আছে ?
না, অসুবিধা নাই, বসুন।
ফরিদ বসে। দু'জনের কারো মুখেই কোনো কথা নেই। দু'জনেই ঝিম ধরে বসে আছে। ইয়াকুব দূর থকে দৃশ্যটা দেখে। সে ছুটে গিয়ে আমিন সাহেবকে ঘটনাটা বলে, আমিন সাহেবও দূর থেকে দৃশ্যটা দেখে, যূথী আর ফরিদ বসে আছে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। দু'জনই চুপচাপ বসে আছে।

দশ

স্কুলে ঘণ্টা বেজেছে। প্রধান শিক্ষক সাহেব তার বাড়ির বারান্দায় বসে কিসের যেন হিসাব দেখছে। স্ত্রী জুলেখাকে ডেকে চিনি কম দিয়ে এক কাপ চা দিতে বলেন। জুলেখা তাকে বলে স্কুলের ঘণ্টা বেজে গেছে। তার তাড়াতাড়ি স্কুলে যাওয়া উচিত। কিন্তু প্রধান শিক্ষক সাহেবের স্কুলে যাওয়ার কোনো তাড়া নেই। জুলেখা তাকে আবারো বোঝায় যে, তিনি স্কুলের প্রধান শিক্ষক- তার দেরি করে স্কুলে যাওয়া ঠিক না। কিন্তু আবদুর রহমান সাহেব কিছুতেই কিছু বুঝলেন না। উল্টো আরো বলেন, গ্রামের স্কুল ঢিলাঢালা নিয়মে চলবে। জুলেখা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বিরক্ত মুখে চা বানাতে চলে যায়।

চা খেয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে আবদুর রহমান সাহেব চায়ের দোকানে এসে বসেন। তিনি আবার চা খাবেন। কুদ্দুস তাকে জিজ্ঞেস করে, আজ স্কুল নাই ?

প্রধান শিক্ষক বলে, স্কুল আছে তবে একটু দেরি করে যাবো, আজ শরীর যুত নাই। কুদ্দুস চায়ের কাপ হাতে দিতে দিতে বলে, আমরার শওকত স্যার বিবাহ করতেছেন। এই ঘটনা কী সত্য ? উনার যে বন্ধু আছে তার বইন।

আমিও উড়াউড়া শুনতেছি। ব্যক্তিগত বিষয় তাই কিছু জিজ্ঞেস করি না। তয় বিবাহ না হইলে ভাল হয়। মেয়ের চরিত্র ভাল না।

চরিত্র ভাল না কে বলেছে ?

কেউ বলে নাই। তবে বুঝা যায়। চাল চলনে বুঝা যায়। কথায় আছে,

গরু চিনি বলনে
নারী চিনি চলনে।

এর মধ্যে আবদুর রহমান সাহেবের চা খাওয়া শেষ হয়। তিনি ওঠে স্কুলের পথ ধরেন।

ফুলি স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়। এমন সময় তার মা আমিনা এসে তার হাতে তেলের শিশি ধরিয়ে দেয়, দোকান থেকে তেল আনতে হবে। তেল না আনলে রান্না হবে না। ফুলি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে স্কুলে ঘণ্টা বেজে গেছে। তার দেরি হয়ে যাবে। আমিনা কিছুতেই শুনবে না। দু'একদিন স্কুলে দেরি হলে কোনো অসুবিধা হয় না। এই বলে আমিনা ফুলিকে তেল আনতে বাধ্য করে। স্কুলের বই-খাতা রেখে তেলের শিশি নিয়ে ফুলি বের হয়। কিছু দূর এসে দেখে স্কুলের মাঠে এসেম্বলি শুরু হয়ে গেছে। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ এসেম্বলি দেখে। তারপর তেলের জন্য পা বাড়ায়।

নীলা যূথীর সাথে ফরিদের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আমিন সাহেবের কাছে যায়। সে বিবাহের প্রস্তাব পাড়ে।

আমিন সাহেব বলেন, যূথী রাজি হলে বিবাহ হবে। তুমি আগে দেখ সে রাজি কিনা।

নীলা যূথীর কাছে যায়। বলে, যূথী তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, সরাসরি জবাব দেবে, হ্যাঁ বা না।

যূথী বলে, সরাসরি বলবো।

নীলা বলে, আমার ভাইকে তুমি চেন, তার সাথে তোমার বিয়ে দিতে চাই। তুমি রাজি আছ?

যূথী বলে, না।

নীলা হতভম্ব হয়ে যায়। যূথীর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে নীলার আর এই গ্রামে থাকতে ইচ্ছে করে না। সে রিকশা ডাকিয়ে আনে। রিকশায় মালপত্র উঠানো হয়। শওকত আরেকটা দিন থেকে যাওয়ার অনুরোধ করে। কিন্তু নীলা কিছুতেই আর থাকবে না। সে রিকশায় উঠে বসে। রিকশা চলতে শুরু করে। যেতে যেতে ফরিদ নীলাকে বোঝায় সরাসরি না করে দেওয়ায় অহংকারে লাগার কিছু নেই। তার পছন্দ-অপছন্দ থাকাটা স্বাভাবিক। হঠাৎ কি মনে করে নীলা রিকশা চালককে রিকশা বাড়ির দিকে ঘোরাতে বলে। আরেকটা দিন থেকে যেতে চায় সে। ঐ মেয়েকে সে জিজ্ঞেস করতে চায় কেন সে এক কথায় না করে দিল। এটা না জানা পর্যন্ত তার শান্তি নেই।

বট গাছের নিচে জারি গানের আসর বসেছে। গ্রামের ছেলে-বুড়ো-মহিলা সবাই এসেছে। শওকত আছে, ফরিদ, নীলা আছে। যূথীও এসেছে। সে এসে নীলার পাশে বসে। শওকত আসর শুরু করে। সে বলে, আজ আমরা এখানে একটা উৎসবের আয়োজন করেছি। উৎসবের বিষয় হলো সময়ানুবর্তিতা। সময়ের কাজটা ঠিক সময়ে করা। স্কুল শুরু হয় সাড়ে নয়টায়। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক সবাই যেন ঠিক নয়টায় স্কুলে উপস্থিত হন। শওকতের ইশারায় গায়ক গান শুরু করে,

মরি হায় রে হায়
দুঃখে পরাণ যায়
সাড়ে নয়টার স্কুল বসে সাড়ে দশটায়।
দোহার বলে, কে যায় সাড়ে দশটায়?

গায়ক বলে, ছাত্রছাত্রীরাতো যায়ই মাঝে মাঝে শিক্ষকও যায়, প্রধান শিক্ষেকের দিকে তাকিয়ে বলে, তাই না হেড মাস্টার সাহেব? প্রধান শিক্ষক সাহেব বিব্রত ভঙ্গিতে এদিক ওদিক তাকান।

গায়ক আবার শুরু করে,

ঘণ্টা বাজবে ঠনঠন
মন হবে উচাটন

স্কুলে যাইতে হবে।
দোহার বলে, সময় মত স্কুলেতে হাজির হইতে হবে।
গায়ক বলে, চলবে না চলবে না
এমন ভাবনা চলবে না
নতুন ভাবনা ভাব।
সময় ধরে নিয়ম করে
স্কুলেতে যাব।

মরি হায় রে হায়
দুঃখে পরাণ যায়
সাড়ে নয়টার স্কুল বসে সাড়ে দশটায়।

আসর শেষ হতে হতে অনেক রাত হয়।

জোছনার ফুল

এগার

যাওয়ার আগে নীলা আরেকবার যূথীর সাথে দেখা করে। সে জানতে চেষ্টা করে যূথী কেন এক কথায় তার ভাইকে বাতিল করে দেয়। যূথী তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে- আপাতত সে তার বিয়ে নিয়ে ভাবছে না। ফরিদকে যে তার অপছন্দ তা নয়। আর পছন্দ হলেই যে বিয়ে করতে হবে এমন কোনো কথা তো নেই। নীলা কিছুতেই ব্যাপারটা বুঝতে চায় না। সে যূথীকে শিক্ষা দিতে চায়। ফরিদের সঙ্গে বিয়ে দিয়েই শিক্ষাটা দিতে চায়। এই ব্যাপারে সে শওকতের সাহায্য চায়। শওকত কোনো আশ্বাস দিতে পারে না।
নীলা ও ফরিদ রিকশায় ওঠে, নীলা রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে বসে আছে। ফরিদ ক্যামেরা বের করে গ্রামের ছবি তোলে। নীলা তাকে ছবি তুলতে বারণ করে। ফরিদ বোনের বিরক্ত মুখের ছবি তুলতে শুরু করে।

স্কুল বসেছে। শওকত একটি কুপি, দু'টি ছোট টিনের বাটি ও একটি কাঁচের গ্লাস ও একটি কাঠি আইসক্রিম নিয়ে ক্লাসের দিকে যাচ্ছে। ব্যাপারটা লক্ষ্য করেন প্রধান শিক্ষক সাহেব। তিনি শওকতকে এইসব হাবিজাবি নিয়ে ক্লাসে যেতে বারণ করেন। শওকত বলে, পদার্থের তিন অবস্থা- কঠিন, তরল ও বায়বীয় ছাত্রছাত্রীদের সরাসরি

দেখাতে পারলে ভাল হয়। ক্লাস ইন্টারেস্টিং হয়। আনন্দময় হয়। তবু প্রধান শিক্ষক ব্যাপারটা বুঝতে চান না। তখন শিক্ষক রেহানা একটা উদাহরণ দিয়ে প্রধান শিক্ষক সাহেবকে বোঝানোর জন্য শওকতকে অনুরোধ করে। শওকত বলে, যেমন ধরুন স্যার, আমি ঠিক করেছি সপ্তাহে একদিন এক ঘণ্টার একটি ক্লাস নেব। ক্লাসটার নাম- প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়। এই মঙ্গলবার আমি তাদের জঙ্গলে নিয়ে ছেড়ে দেব। তাদের বলব, জঙ্গলে নানান গাছ আছে। একেক রকম গাছের একেক রকম পাতা। একটা কম্পিটিশন হবে।

প্রধান শিক্ষক বলেন, কাজের কাজ কিছু হবে না। জঙ্গলে হাঁটাহাঁটি হবে। রেহানা বলে, অবশ্যই হবে। এখন থেকে আমরা সকলে এভাবে পড়াবো।

শওকত বলে, এবং তার নাম হবে আনন্দময় শিক্ষা অভিজ্ঞতা।

প্রধান শিক্ষক সাহেবের কোনো কিছুই পছন্দ হয় না। তিনি কপাল কুঁচকে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকেন।

যূথী মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নেয়। সে স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা প্রকল্প করবে। বিখ্যাত লেখকদের সব লেখা সে ছেলেমেয়েদের পড়ে শোনাবে। ব্যাপারটা সে তার বাবা আমিন সাহেবকে জানায় এবং বলে উনারও মানুষের উপকারে আসে এমন কাজ করা উচিত। শুনে আমিন সাহেব যূথীকে কড়া একটা ধমক দেন এবং বলেন, শওকত তোমার মাথায় এইসব পোকা ঢুকিয়েছে। মাথা থেকে এইসব পোকা বের কর। তোর এখন কাজ- একটা বিয়ে শাদী করে সংসার। মুখ ভার করে যূথী আমিন সাহেবের সামনে থেকে চলে যায়।

ইয়াকুব শওকতকে ডেকে একটা কড়া ধমক দেওয়ার পরামর্শ দেয় আমিন সাহেবকে। ইয়াকুবের পরামর্শ বেশ পছন্দ হয় আমিন সাহেবের। তিনি শওকতকে রাতেই তলব করেন।

রাতে শওকত খেতে বসলে খালা বিয়ের আলাপ তোলেন। একটা মেয়েকে তার খুবই পছন্দ। শওকত অনুমতি দিলে তিনি কথা চালাচালি শুরু করতে পারেন। শওকত হেসে ব্যাপারটা উড়িয়ে দেয়। এমন সময় ইয়াকুব এসে ডাকে। আমিন সাহেব শওকতকে আজ রাতেই দেখা করতে বলেছেন। সংবাদ দিয়ে ইয়াকুব চলে যায়।

রাতে খাওয়া দাওয়া শেষ করে শওকত আমিন সাহেবের বাড়ি যায়। এই কথা সেই কথার পর আমিন সাহেব আসল কথা তোলেন। বলেন, যূথীর মুখে শুনতে পেয়েছি সে নাকি তোমার স্কুলে কী কাজ পেয়েছে। গল্প বলার কাজ ? একটু বিস্মিত কণ্ঠে শওকত বলে, আমার স্কুল বলছেন কেন ? স্কুল আমাদের সবার। আমিন সাহেব বলেন, তুমি

আমার মেয়ের মাথায় কী পোকা ঢুকিয়েছ? ঘরের খেয়ে সে বনের বাঘ-ভাল্লুক তাড়াবে? সে স্কুলের কেউ না। তার আবার স্কুলের কাজ কী?

শওকত বলে, চাচাজি আমিতো আগে একবার বলেছি স্কুলটা আমাদের সবার। স্কুলের কাজ আমাদের সবার কাজ। তাছাড়া আমি তার মাথায় কোনো পোকা ঢুকাইনি। সে যা করতে চাচ্ছে সেটা অসাধারণ একটা কাজ। আমি খুব খুশি যে তার মাথায় এত ভাল একটা পোকা ঢুকেছে।

আমিন সাহেব তীব্র দৃষ্টিতে শওকতের দিকে তাকিয়ে আছেন। শওকত বিদায় নিয়ে চলে যায়।

পরদিনই যূথী তার কাজ শুরু করে। স্কুলের সব বাচ্চাদের নিয়ে সে পুকুর ঘাটে গোল হয়ে বসে। বাচ্চাদের সে বলে, এখন যে কবিতাটা পড়ব সেটা লিখেছেন সুকুমার রায়। তিনি বাচ্চাদের জন্য অসাধারণ সব লেখা লিখেছেন। যূথী পড়তে শুরু করে,

রামগরুড়ের ছানা হাসতে তাদের মানা
হাসির কথা শুনলে বলে
হাসব না-না, না-না।
সদাই মরে ত্রাসে ঐ বুঝি কেউ হাসে!
এক চোখে তাই মিটমিটিয়ে
তাকায় আশে পাশে।
ঘুম নাহি তার চোখে আপনি বকে বকে
আপনারে কয় হাসিস যদি
মারব কিন্তু তোকে।

ছেলেমেয়েরা মুগ্ধ হয়ে শোনে। আমিন সাহেব দূর থেকে দৃশ্যটা দেখে। তার কপালে চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে।

জোছনার ফুল

বার

দেখতে দেখতে বর্ষাকাল এসে গেছে। আকাশে ঘন হয়ে মেঘ করেছে। মাঠের মাঝখান দিয়ে হাঁটছে শওকত। আকাশের দিকে তাকিয়ে তার কবিতা মনে পড়ে। সে কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে আপন মনে,

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ ভরসে
ঘন গৌরব নবযৌবনা বরষা

শ্যাম গম্ভীর সরসা

হঠাৎ তার চোখে পড়ে মাঠের মাঝে ছোট্ট একটা মেয়ে দৌড়াচ্ছে, তার পেছনে দু'টি ছাগল ছুটছে। মেয়েটা পড়ে যায়। শওকত এসে তাকে তোলে। সে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে ব্যথা পেয়েছে কি না। মেয়েটি 'না'-সূচক মাথা নাড়ে। শওকত মেয়েটাকে কোল থেকে নামিয়ে দেয়। মেয়েটি আবার দৌড় দেয়। কিছু দূর গিয়ে আবার পড়ে যায় মেয়েটি। এবার সে নিজে নিজে ওঠে। শওকতের দিকে তাকিয়ে থাকে। শওকত হাসে।

বৃষ্টি নেমেছে। ছোট ছোট ছেলেরা মাঠে বৃষ্টির মধ্যে বাতাবি লেবু দিয়ে ফুটবল খেলে। দৃশ্যটা দেখে শওকতের খুব আনন্দ হয়। সে হাসে।

শওকত যখন বাড়িতে ঢোকে তখন সে ভিজে একসার। খালা গামছা নিয়ে এগিয়ে আসে। বৃষ্টিতে ভেজার জন্য ভর্ৎসনা করে। তোর একটা চিঠি এসেছে, বলে খালা একখানা চিঠি এনে দেন। শওকত খাম উল্টে নাম ঠিকানা পড়ে খালার হাতে চিঠি ফেরৎ দিয়ে বলে, টেবিলে রেখে দাও, পরে পড়ব। খালা জিজ্ঞেস করে, কার চিঠি? শওকত বলে নীলার। খালা বলে, এখন পড়, পরে কী জন্য। শওকত বলে, ভালমতো বৃষ্টিতে ভিজতে পারিনি। আরো কিছুটা ভিজব। বলে আবারো বৃষ্টিতে নেমে যায়। মনের আনন্দে কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে,

গুরুগর্জনে নীপমঞ্জরী শিহরে
শিখি দম্পতি কেকাকল্লোলে বিহরে
দিগবধূচিত হরষা
ঘনগৌরবে আসে উন্মাদ বরষা।

বৃষ্টি দেখে যূথীরও মনের মধ্যে আনন্দ দোলা দিয়ে ওঠে। সে পুকুর ঘাটে এসে বসে বসে বৃষ্টিতে ভেজে। আমিন সাহেব ছাতা মাথায় দিয়ে মেয়ের পাশে এসে দাঁড়ান। বলেন, তোর হইছে কী? যূথী জবাব দেয়, কিছু হয় নাই।

কিছু হয় নাই তো ভিজছোস কী জন্য?

অনেকদিন পর বৃষ্টি। ভিজতে ভাল লাগতেছে। বাবা তুমিও ছাতাটা বন্ধ করে ভিজ। মজা লাগবে।

আমিন সাহেব ছাতা বন্ধ করে মেয়ের পাশে বসেন। কিছুক্ষণ ভিজেন। গম্ভীর গলায় বললেন, কই আনন্দ কই? যূথী হেসে ফেলে। কিছু বলে না, আমিন সাহেব গজর গজর করতে করতে উঠে যান।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে শওকত বিছানায় শুয়ে নীলার চিঠি পড়ে। নীলা লিখেছে,

শওকত ভাই,

কেমন আছেন আপনি ? আপনার স্কুল কেমন চলছে ? আপনি বলে দিয়েছিলেন শিক্ষা বিষয়ক নতুন কিছু জানলে আপনাকে জানাতে। এখন জানাচ্ছি। একটি শিশুর শিক্ষা স্কুলে ভর্তি হবার অনেক আগে থেকেই শুরু হয়। শিক্ষক এবং শিশুর বাবা-মা শিশুর জ্ঞান বুদ্ধি হবার আগে থেকেই শিক্ষা প্রক্রিয়া শুরু করেন। যা পরবর্তীতে শিশুর মানসিকতা গঠনে সাহায্য করে। আরো ব্যাপকভাবে বললে বলতে হয়, শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ শুরু হয় মাতৃগর্ভে। শিশুর যত্ন শুরু করতে হয় তখন থেকেই। আমি এই বিষয়ে আপনাকে কিছু কাগজপত্রও পাঠালাম। আপনি কাগজপত্রগুলো পড়ে বাচ্চাদের অভিভাবকদের সঙ্গে বসুন। মজার একটা মিটিং করে ফেলুন। মজার মিটিং করার ব্যাপারে আপনার মতো বুদ্ধি কারো নেই।

এতক্ষণ কাজের কথা বললাম। এখন কিছু অকাজের কথা বলি ? যূথী কেমন আছে ? আপনি কি দয়া করে যূথীর সঙ্গে দেখা করে তাকে বলবেন, ফরিদ নামের মানুষটা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কিছু মানুষদের একজন। তার সঙ্গে জীবন কাটানোটা যে কোনো মেয়ের জন্যই হবে পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।

ইতি

নীলা।

নীলার চিঠি পড়ে শওকতের খুব জানতে ইচ্ছে করে তার সঙ্গে জীবন কাটানো কোনো মেয়ের জন্য কেমন ব্যাপার, সৌভাগ্যের না দুর্ভাগ্যের ?

রাতে কাঁপুনি দিয়ে যূথীর জ্বর আসে। সে কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে। আমিন সাহেব থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর মাপেন। একশ এক। যূথী বলে, এ এমন কোনো জ্বর না। সকালেই সেরে যাবে।

শওকত আসে আমিন সাহেবের কাছে। ইয়াকুব এসে খবর দেয়। শওকতের কথা শুনেই আমিন সাহেবের রাগ চড়ে যায়। তিনি বলেন, সে আসছে কী জন্য ? বৃষ্টিতে ভেজার বুদ্ধি দিতে ? যাও বসতে বল। যূথী বলে, বাবা, ওনার ওপর তুমি কোনো রাগ করবা না। উনি আমারে কোনো বুদ্ধি দেন নাই। আমি অন্যের বুদ্ধিতে চলি না। আমি চলি নিজের বুদ্ধিতে।

নিজের বুদ্ধিতে চলার ফলাফলতো দেখতেই পাইতেছি, বলতে বলতে আমিন সাহেব বেরিয়ে যান।

শওকত আমিন সাহেবকে বৈঠকের কথা বলে। গ্রামের লোকজনদের সাথে শিশু লালন পালন নিয়ে কথা বলার জন্য বৈঠক করবে। সেই বৈঠকে আমিন সাহেবকে থাকতে বললে আমিন সাহেব আবার রেগে যান। তার তো ছোট ছেলেমেয়ে নেই যে তাকে বৈঠক করে শিশু পালন শিখতে হবে। বড় একটা মেয়ে সে-ই তার কথা শোনে না। আর গ্রামের মানুষ। কথা শুনলে কী আর বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর হয়! যূথীর জ্বরের কথা শুনে শওকত তাকে দেখতে যেতে চায়। আমিন সাহেব এতে খুশিই হন। তিনি বলেন, দেখে যাও, তাকে বলবা মুরব্বিদের কিছু কথা শুনতে।

শওকত যূথীর ঘরে ঢোকে, তাকে দেখে যূথীর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। উঠে বসে।
শওকত বলে, রুগী দেখতে এসেছি।
দেখেন রুগী দেখেন।
শওকত যূথীর পাশে বসে।
আমার ওপর একজন দায়িত্ব দিয়েছে তোমায় কিছু কথা বলার। কথাগুলো বলি ?
দায়িত্ব কে দিয়েছে ? নীলা ?
তোমার বুদ্ধিতো দেখি খুবই ভাল। আমার তো এখন মনে হচ্ছে সে কি দায়িত্ব দিয়েছে তাও তুমি জান।
যূথীর ভেতর একটা আন্দোলন তৈরি হয়। মনে মনে সে ভাবে এই শিক্ষক কবে বুঝবে তার কথা, তার ব্যাকুলতা। অনেক কষ্টে সে নিজেকে সংযত করে বলে, জানি। শওকত ভাই শুনুন, আমার এখন অন্যের কোনো কথা শুনতে ইচ্ছা করছে না, আপনার যদি কোনো কথা থাকে আমি খুব আগ্রহ করে শুনব।
শওকত বলে, আমার কথা হলো তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠ।
শওকতের কথা শুনে যূথী খুবই হতাশ হয়। সে বলে, আপনার এই কথা ?
হ্যাঁ। যূথী যাই।
যূথী ক্লান্ত হতাশ কণ্ঠে বলে, আচ্ছা যান।
শওকত বেরিয়ে যায়। যূথী তার যাওয়ার দিকে চেয়ে থাকে।

গ্রামবাসীদের সাথে শওকত বৈঠকে বসেছে। শিশুর যত্ন ও মানসিকতা গঠন বিষয়ক বৈঠক। অনেকেই উপস্থিত আছেন বৈঠকে। শওকত বলতে শুরু করে,
আমরা একটা ব্যাপার জানি। শিশুরা বড় হয়, একসময় স্কুলে যায়, তখন শুরু হয় তাদের শিক্ষা। আসল ব্যাপার তা-না। শিক্ষা শুরু হয় জন্মের পরপরই। শিশুরা তাদের চারপাশের জগত দেখে। তারা শিখতে শুরু করে। শিশুরা শেখে তাদের চারপাশের পরিবেশ থেকে। শিশুর আশেপাশে যারা আছে তাদের কাছ থেকেই তারা শেখে। তৈরি হতে থাকে শিশুদের মন-মানসিকতা। কাজেই আমাদের এই বিষয়টি মাথায় রেখে

শিশুদের বড় করতে হবে। তাদের কৌতূহল মেটাতে হবে। তাদের সঙ্গে গল্প করতে হবে। তাদের বই পড়ে শোনাতে হবে।

বৃদ্ধ হরিছ মিয়া বলেন, অনেক বাবা-মা আছেন লেখাপড়া জানেন না, তাঁরা বই পড়ব ক্যামনে ? এর জবাবে শওকত বলে, সবচেয়ে ভাল হয় বাবা-মারা যদি লেখাপড়া শিখে নেন। বয়স্কদের পড়াশোনা শেখানোর ব্যবস্থা আমাদের আছে। যাদের পক্ষে তা সম্ভব হবে না তাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে হরিছ মিয়া আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে, কী ব্যবস্থা। শওকত বলে, যারা পড়তে পারে তারা পড়ে শুনাবে। গ্রামের ত্যাড়া মানিক ফোড়ন কেটে বলে,

পেটে নাই ভাত
আমি উঁচা জাত।

শওকত বলে, পেটে ভাত নাই। আমরা দরিদ্র। সবই ঠিক আছে। তারপরও আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এবার মওলানা সাহেব উঠে দাঁড়ান। তিনি বলেন, অবশ্যই আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এই শিশুরাই এক দিন বড় হবে। তখন তারা আনন্দ নিয়ে বলবে, মুরব্বিরা আমাদের ঠিকমত যত্ন নিয়েছিলেন। চারা শুধু বুনলেই হয় না। চারার যত্ন করতে হয়।

মওলানা সাহেবের কথার মধ্য দিয়ে সেদিনের মতো বৈঠক শেষ হয়।

নীলার বাবা যূথী সম্পর্কে নীলাকে নানা কথা জিজ্ঞেস করে। নীলা কোনোটারই সঠিক জবাব দেয় না। এমনিতেই নীলা বাবার সাথে চটাং চটাং কথা বলে। যূথীর বিষয়ে তার মনমেজাজ খারাপ। বাবা প্রস্তাব দেয় তিনি নিজে গিয়ে যূথীকে দেখে আসবেন। নীলা তাতে সায় দেয়। বাবা নীলার মাকেও সাথে নিতে চান। নীলার তাতেও কোনো আপত্তি নেই। তিনি নীলাকেও সাথে যেতে অনুরোধ করেন। নীলা বলে, না। আমার গ্রাম ভাল লাগে না। আমি শহরের মেয়ে। আমার ভাল লাগে গাড়ি, রিকশা, ভীড়, গাড়ির হর্ণ এইসব।

মেয়ের কথায় বাবা খুবই আহত হন।

স্কুলের নতুন শিক্ষিকা রেহানা ক্লাস নিচ্ছেন। ক্লাস রুমে ছেলেমেয়েরা ৪টি গ্রুপে ভাগ হয়ে বসেছে। একদল অতি ছোট ছেলেমেয়ে- রেহানাকে ঘিরে বসে আছে। রেহানা তাদের কবিতা বলছে,

ঐ দেখা যায় তাল গাছ ঐ আমাদের গাঁ
ঐ খানেতে বাস করে কানাবগির ছা।

এইটুকু বলে রেহানা থামে এবং বাচ্চাদের উদ্দেশ্য করে বলে এইবার তোমরা একেকজন একেক লাইন করে বলতে থাক,

ও বগি তুই খাস কি ?
পান্তা ভাত চাস কি ?
পান্তা আমি খাই না।
পুঁটি মাছ পাই না।
একটা যদি পাই
অমনি ধরে ঘাপুস ঘুপুস খাই।

এই দলকে কবিতা বলতে দিয়ে রেহানা অন্য দলে যায়। এইদলে ছেলেমেয়েরা ছবি আঁকছে। রেহানা এক এক করে সকলের ছবি আঁকা দেখে।

এবার সে এগিয়ে যায় অন্য দলে, এখানে ছেলেমেয়েরা নাটক করছে। রেহানা তাদের নাটক দেখে, নাটকের বিষয় লজেন্স কেনা বেচা। লজেন্স কেনা বেচা করে বাচ্চারা এখানে গুণ শিখছে, দেখে রেহানা খুব খুশি হয়। সে তাদের আরেকটা নাটক করতে বলে যা দিয়ে ভাগ শেখা যাবে। রেহানা ক্লাসের অন্য অংশে এগিয়ে যায়।

তের

দুইবার বৃষ্টিতে ভিজে শওকতের জ্বর চলে আসে। সে উঠানে মাথা উপুড় করে বসে আছে। খালা তার মাথায় পানি ঢালছে। এমন সময় ফজলু মিয়া আসেন। তাঁর মেয়ের বিয়ে। তিনি শওকতকে দাওয়াত দিতে আসেন। শওকত জ্বর নিয়ে যেতে পারবে না বলে জানায়। কিন্তু নাছোড়বান্দা ফজলু মিয়া বলে শওকত না গেলে মেয়ের বিয়েই দেবেন না। অগত্যা খালা বলে দেন, ঠিক আছে সে যাবে। শুনে ফজলু মিয়া খুশি হয়ে বিদায় নেন।

ফজলু মিয়ার এই মেয়েটি খুবই ভাল। তার এই বিয়ের পেছনে শওকতের অনেক হাত আছে। বিয়ে ঠিক হবার পর প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহমান সাহেব উল্টাপাল্টা কথা বলে বিয়ে ভেঙে দেয়। অনেক দৌড়াদৌড়ি করে শওকত পুনরায় বিয়ে ঠিক করে। প্রধান শিক্ষক সাহেবও দাওয়াত পেয়েছেন। বিয়েতে যাবেন বলে তিনি স্ত্রীকে দিয়ে পাঞ্জাবি ইস্ত্রি করাচ্ছেন। স্ত্রী বলে, পাঞ্জাবি ইস্ত্রি করে বিয়ে খেতে যাচ্ছেন যান। একটা অনুরোধ করি, প্রধান শিক্ষক সাহেব বলে মানুষ যে সম্মান করে সেই সম্মানের দাম দিয়েন।

এদিকে আমিন সাহেব রেগে মেগে বোম হয়ে আছেন। ফজলু মিয়া তাঁকে বিয়ের দাওয়াত দেয় নাই। তাঁর ইচ্ছে করছে, ফজলুকে ডেকে এনে ধমকে দেন। বিষয়টা

তিনি যূথীকে বলেন। যূথী তাঁকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয় যে, ফজলু মিয়া যা করেছেন ঠিক করেছেন। এর আগে বহু মানুষ আমিন সাহেবকে দাওয়াত করেছেন কিন্তু কারো দাওয়াতেই তিনি যাননি। তাই তাঁকে দাওয়াত দেওয়া না দেওয়া সমান কথা। কিছুতেই আমিন সাহেবের রাগ পড়ে না, শেষে যূথী বলে, তুমি একটা কাজ কর বাপজান। ফজলু চাচার বাড়িতে যাও। বাড়িতে গিয়ে বল, তুমি তো আমারে দাওয়াত দেও নাই। আমি নিজে থাইক্যা উপস্থিত হইলাম। মেয়ে জামাইরে ডাক দেও। দোয়া করি। এই কাজটা যদি তুমি করতে পার গ্রামের মানুষ যে কী খুশি হবে। নানান জায়গায় গল্প করবে।

যূথীর কথায় আমিন সাহেব একটু চিন্তিত হয়ে পড়েন। একবার ভাবেন যাই, আবার ভাবেন- না, এ হয় না। শেষে তিনি যাবেন বলেই মনস্থির করেন।

বিয়ের আসরে কাজী সাহেব বিয়ে পড়াচ্ছেন। প্রধান শিক্ষক, শওকতসহ গ্রামের অন্যরা আছেন, ত্রিশ হাজার এক টাকা দেনমোহর ধার্য হয়েছে। মেয়ের দিকের দুই উকিল ঠিক করা হয়েছে মেয়ের মামা ও প্রধান শিক্ষক সাহেবকে। কাজী সাহেব মেয়ের মামা ও প্রধান শিক্ষক সাহেবের স্বাক্ষর নেন রেজিস্ট্রি খাতায়। এমন সময় আমিন সাহেব এসে হাজির হন। সবাই হতভম্ব। ফজলু মিয়া ছুটে আসে। আমিন সাহেব বলেন, ফজলু তুমি তো আমারে দাওয়াত দেও নাই। আমি নিজেই উপস্থিত হয়েছি। মেয়ে এবং মেয়ে জামাইকে ডাক, দোয়া করে দিই।

ফজলু মিয়া মেয়ে ও মেয়ে জামাইকে ডাকতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। উপস্থিত সবাই পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

ফরিদ ও নীলার বাবা হোসেন সাহেব একাই চলে আসেন শওকতদের গ্রামে। একটা রিকশা নিয়ে তিনি গ্রামে ঢোকেন। সহজ-সরল মানুষ হোসেন সাহেব। রিকশা চালক নানান কথার ফাঁকে তার কাছ থেকে গ্রামে আসার কারণ জেনে নেয়। তিনি এসেছেন যূথীকে দেখতে। এই বিষয় জানতে পেরে রিকশা চালক তাকে আমিন সাহেবের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যায়। আমিন সাহেবের বাড়ি দেখে হোসেন সাহেব বিস্মিত হয়ে ওঠেন। তার ছেলের বন্ধু স্কুল শিক্ষক শওকতের এত বড় বাড়ি! বাড়িতে কেউ আছে ? এই বলে হোসেন সাহেব ভিতরে ঢুকে পড়েন। আমিন সাহেব ইজি চেয়ারে বসে রোদ পোহাচ্ছেন। মুখ ঢেকে রেখেছেন গামছা দিয়ে, যেন মুখে রোদ না লাগে। হোসেন সাহেব ভিতরে ঢুকে সালাম দেন,

‘আসসালামু আলাইকুম’।

আমিন সাহেব বলেন আপনাকে তো চিনলাম না। আপনার পরিচয় কী ?

আমার কোনো পরিচয় নাই জনাব। আমি এক নাম গোত্রহীন...

আমিন সাহেব বিস্মিত হন। পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, কাকে চান ?

শওকতকে, আমার ছেলের বন্ধু... আমিন সাহেব লাফিয়ে ওঠেন, আমার বাড়িকে কী স্কুল ঘর মনে হয় ? যে মাস্টারকে খুঁজতে ঢুকে পড়েছেন ? আমিন সাহেবের চিৎকার শুনে ঘর থেকে যূথী বেরিয়ে আসে। যূথীকে দেখেই হোসেন সাহেব চিনতে পারেন- ফরিদের ঘরে যূথীর ছবি দেখেছেন তিনি। যূথীকে দেখে তিনি ভরসা পান। বলেন, মাগো তোমাকে আমি চিনি। তুমি অবশ্যই যূথী। আমার ছেলের ঘরে তোমার ছবি দেখেছি। আমি ফরিদের বাবা। পরিচয় পেয়ে যূথী হোসেন সাহেবকে সালাম করে। হোসেন সাহেবের ভীত চেহারা দেখে সে হেসে ফেলে। যূথী তাঁকে শওকতদের বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা নেয়।

চৌদ্দ

স্কুল শুরুর ঘণ্টা বেজেছে। ছাত্রছাত্রীরা স্কুলের দিকে যাচ্ছে। প্রধান শিক্ষক সাহেব তার বাড়ির উঠানে বসে চা খাচ্ছেন। জুলেখা এসে জিজ্ঞেস করেন, তিনি স্কুলে যাচ্ছেন না কেন ? তিনি আজ চিন্তা করতে বসেছেন। আজ তার স্কুল নেই। তার কথায় জুলেখা খুবই রাগ করে। সে কাজে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর ফিরে আসে। আব্দুর রহমান জুলেখাকে বলেন, স্কুলে চাকরি নেওয়া তার ঠিক হয় নাই। এ বিষয় নিয়েই তিনি চিন্তা করছেন। পকেট থেকে সিগারেট বের করেন। জুলেখা বলেন, আপনি শিক্ষক, আপনার কী সিগারেট খাওয়া ঠিক! আপনাকে দেখে ছাত্ররা শিখবে। স্ত্রীর কথায় রহমান সাহেব সিগারেটটা দুমড়ে মুছড়ে ফেলেন। জুলেখা তাকে ভাল করে চিন্তা করতে বলে আবার ভেতরে চলে যায়।

দুপুর গড়িয়ে যায় আব্দুর রহমানের চিন্তা আর শেষ হয় না। মাঝে একবার এসে জুলেখা ভাত খাওয়ার তাগিদ দিয়ে যায়। তাতেও তার চিন্তার কাজ শেষ হয় না।

আমিন সাহেব তার বাড়িতে হোসেন সাহেবকে দুপুরে ডাল-ভাত খাওয়ার দাওয়াত দেন। দাওয়াতে যাবেন কি যাবেন না এই নিয়ে হোসেন সাহেব দুঃশ্চিন্তায় পড়ে যান। আমিন সাহেবের বাড়িতে ঢুকে একবার যেই বিপদে তিনি পড়েছেন। দাওয়াত খেতে গিয়ে না আবার কোন বিপদে পড়েন। বিষয়টা নিয়ে তিনি শওকতের খালার সাথে আলোচনা করেন। শওকতের খালা তাঁকে যাওয়ারই পরামর্শ দেন। অবশেষে তিনি দাওয়াত কবুল করতে চলে আসেন। দস্তরখানা পেতে খাওয়া দেওয়া হচ্ছে। খাবারের মধ্যে আছে শুধু ডাল আর ভাত। ডাল-ভাত খেতে দিয়ে আমিন সাহেব তাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তিনি এক কথার মানুষ। ডাল-ভাত খেতে বলেছেন। তাই আয়োজনও

তাই। হোসেন সাহেব খুবই বিস্মিত হন। তিনি বলেন, আপনে যেমন এক কথার মানুষ আমি আবার নানান কথার মানুষ। একেক সময় একেক কথা বলি। আপনার কাছে আমার এক কথা বলা শেখা দরকার। আমিন সাহেব বলেন, শেখেন। চলে আসেন আমার বাড়ি। দুনিয়ার বিস্ময় কণ্ঠে নিয়ে হোসেন সাহেব বলেন, চলে আসব আপনার বাড়ি ? নির্লিপ্ত কণ্ঠে আমিন সাহেব বলেন, যে ক'দিন গ্রামে থাকবেন আমার সঙ্গে থাকবেন। আপনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন সেই উদ্দেশ্যের কথা আমি শুনেছি। আপনার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দেওয়ার ব্যাপারে আমার কোনো অনাগ্রহ নাই। বরং আগ্রহ আছে। আপনার ছেলের মতো ছেলে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। হোসেন সাহেব বলেন, আপনার মেয়ের মতো মেয়ে পাওয়াও ভাগ্যের ব্যাপার। তাহলে আসেন ডাল-ভাত খেতে খেতে বিয়ের একটা দিন তারিখ ঠিক করে ফেলি। আমিন সাহেব বলেন, আমার মেয়েকে তো রাজি করাতে হবে। আপনি থাকেন আমার বাড়িতে। যূথীকে রাজি করান। বিয়ে দিয়ে দিব। এই বলে ইয়াকুবকে হুকুম দেন শওকতদের বাড়ি থেকে হোসেন সাহেবের জিনিসপত্র নিয়ে আসতে।

স্কুল ছুটির ঘণ্টা বেজেছে। ছেলেমেয়েরা সব হৈচৈ করে বাড়ি যাচ্ছে। প্রধান শিক্ষক সাহেব আগের জায়গাতেই বসে আছেন। তাঁর স্ত্রী জুলেখা পাশে এসে দাঁড়ায়। হঠাৎ স্বামীর জন্য তার খুব মায়া হয়। তবু মায়া লুকিয়ে রেখে সে বলে, স্কুল ছুটি হয়েছে। আপনার চিন্তার কাজ কি শেষ হয়েছে, না আরো বাকি আছে ? শান্ত অথচ খুব দৃঢ় কণ্ঠে প্রধান শিক্ষক বলেন, বাকি নাই। চিন্তার কাজ শেষ করেছি। বউ শোনো, চিন্তা করে দেখলাম স্কুলের শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতাই আমার নাই। প্রধান শিক্ষকতো অনেক বড় ব্যাপার। স্কুলের প্রধান হলো নৌকার হাল ধরা মাঝির মতো। হাল যেদিকে ধরবে নৌকা সেই দিকে যাবে। স্কুল মাস্টারি আমি করব না। মানুষ হিসেবে আমি আদর্শ না। আমার কোন গুণ নাই। আমি সত্য কথা বলতেছি। বউ শোনো, চাকরি ছেড়ে দিব। একজন হেড মাস্টারের যে সব গুণাবলি থাকা প্রয়োজন তার কিছুই আমার নাই। বল, কথাটাকি ভুল বলেছি ?

জুলেখা বলে, কথা ভুল বলেন নাই। খাঁটি কথা বলেছেন। খাঁটি কথাতো আপনি বলেন না। আইজ কেন বলতেছেন এইটা তো বুঝলাম না। আসেন ভাত খাইতে আসেন।

বাড়ি গিয়ে শওকত দেখে হোসেন সাহেব নেই। সে তাকে খোঁজ করে, শওকতের খালা হোসেন সাহেবের বিস্তারিত শওকতকে খুলে বলে। আমিন সাহেবের বাড়িতে তার দাওয়াত খেতে যাওয়া। ইয়াকুবের এসে তার জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া। সব। খালার কাছ থেকে সব শুনে শওকত ছোটে গ্রামের হায়দার ভাইয়ের বাড়ি। হায়দার তাঁর বারো বছরের মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছে, এটা অন্যায়, তাঁকে ঠেকাতে হবে।

শওকত হায়দারকে বোঝানোর চেষ্টা করে বারো বছরের মেয়ের বিয়ে দেওয়া অন্যায়। তাছাড়া হায়দারের মেয়ে তাঁর একার না। সুতরাং বিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও তাঁর একার নয়। শওকতের কথায় হায়দার তাঁর মত পাল্টায়, সে মেয়ে কমলাকে ডেকে শওকতকে কদমবুসি করতে বলে। কমলা আসে। শওকত তাকে বলে, প্রাইমারি পাশ করে ফেলেছ এটা মনে করে ঘরে বসে থাকলে হবে না। এবার ক্লাস সিক্সে ভর্তি হতে হবে। আমি মাঝে মধ্যে আসব। খোঁজ নিয়ে যাব। এই বলে শওকত বিদায় নেয়।
রাস্তায় নেমে সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

যূথী পুকুর ঘাটে বসে আছে। তাকে ঘিরে আছে স্কুলের ছোট ছোট বাচ্চারা।
সে তাদের কবিতা শোনাচ্ছে,
মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক করে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার পরে
টগবগিয়ে তোমার পাশে পাশে।
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে
সন্ধে হলে সূর্য নামে পাটে,
এলেম যেন জোড়াদিঘির মাঠে॥

মেয়েকে নিয়ে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত আমিন সাহেব দৃশ্যটি দেখেন। তিনি হোসেন সাহেবকে ডেকে নিয়ে আসেন। বলেন, দেখেন। হোসেন সাহেব খুব আগ্রহ নিয়ে দৃশ্যটি দেখে।

পরদিন প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহমান সাহেব সবার আগে স্কুলে এসে উপস্থিত হন। স্কুলে এসেম্বলি শুরু হয়। ছাত্রছাত্রীরা সব আছে। শওকত আছে। মহিলা শিক্ষক রেহানা আছে। এসেম্বলির শুরুতেই প্রধান শিক্ষক সাহেব কিছু বলতে চান।
তিনি বলেন, আমি তোমাদের একটা খবর দিব। আমি মনে করি তোমাদের জন্য এটা ভাল খবর। নানান কারণে মাস্টারি চাকরি আমি করতে পারতেছি না। এত বড় কাজের যোগ্য আমি না। তাই আমি হেড মাস্টারি ছেড়ে দিচ্ছি। একজন প্রধান শিক্ষক শুধু যে স্কুল ঠিকঠাকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবেন তা না। তিনি নানানভাবে এই অঞ্চলটাকেও এগিয়ে নিবেন। তিনি থাকবেন সবার সুখে দুঃখে। আমি এইসব কাজ করি না।
শওকত এইসব কাজ করে এবং কত ভাল করে তা আমার বলে দিতে হবে না। আমার

ক্ষমতা থাকলে আমি তোমাদের শওকত স্যারকে প্রধান শিক্ষক বানায়ে দিতাম। কিন্তু সরকারি আইনে সেটা সম্ভব না। তবে আমি চলে গেলে আমার জায়গায় আমার চেয়ে ভাল হেড মাস্টার আসবে। এই বলে আব্দুর রহমান সাহেব একটু থামেন। এই সুযোগে শওকত বলে, স্যার আমি একটা কথা বলতে চাই। আপনি যদি অনুমতি দেন। শওকত আবার বলে, যিনি নিজের ভুল ধরতে পারেন, তিনি নিজের ভুল সংশোধনও করতে পারেন। হেড স্যার মহৎ মানুষ তাই তিনি নিজের ভুলের কথা নিজের মুখে বলতে পেরেছেন। এই কাজটা সবাই পারে না। আমরা একজন মহৎ মানুষকে হারাতে চাই না।

শওকতের সাথে তাল মিলিয়ে রেহানাও একই কথা বলল। এইসময় এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। প্রধান শিক্ষক সাহেবের চোখে পানি চলে আসে। ছাত্রছাত্রীরা সবাই হাততালি দিয়ে ওঠে।

পনের

হোসেন সাহেব রাস্তায় ঘুরতে বেরিয়েছেন। পথে দেখেন দু'টি ছেলে মারামারি করছে। ওদের তিনি থামানোর চেষ্টা করেন। এক পর্যায়ে তারা থামে। তিনি জিজ্ঞেস করেন তারা মারামারি করছে কেন ? ওরা জবাব দেয় এমনি। তিনি খুব বিস্ময় বোধ করেন। এমনি এমনি কেউ মারামারি করে! ওদের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় কুদ্দুস ডাক দেয় তাকে। হোসেন সাহেব গিয়ে দোকানে বসেন। কুদ্দুস চা দেয়। তিনি খুব আগ্রহ নিয়ে চা খান। বলেন, তুমি খুব ভাল চা বানাও। তোমার চায়ের কথা আমার অনেকদিন মনে থাকবে। আজ চলে যাচ্ছি।

কুদ্দুস জিজ্ঞেস করে, আবার কবে আসবেন ? সঙ্গে সঙ্গে তিনি জবাব দেন, মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি আসতে হবে। আমার ছেলের বিয়ের কথাবার্তা চালাচ্ছি। মেয়ের বাবা রাজি আছেন, মেয়ে একটু দোটানায় আছে। দেখি কী হয়। কুদ্দুস শওকতকে দিয়ে মেয়েকে বলানোর পরামর্শ দেয়। পরামর্শটা হোসেন সাহেবের মনে ধরে। কুদ্দুসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাড়াতাড়ি রিকশা ঠিক করেন তিনি। শওকতদের বাড়ির সামনে রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। হোসেন সাহেবের মালপত্র রিকশায় তোলা হচ্ছে। রিকশায় ওঠার আগে তিনি শওকতকে দু'টি দায়িত্ব দেন। এক, যূথীর সাথে কথা বলে তাকে বিয়েতে রাজি করানো। দুই, জঙ্গল আলীর বাবার মতো গরিবদের দারিদ্র্য দূর করার জন্য কোনো উপায় বুদ্ধি বের করা।

শওকত আজই যূথীর সঙ্গে কথা বলবে বলে হোসেন সাহেবকে আশ্বাস দেন। হোসেন

সাহেব বিদায় নিয়ে রিকশায় উঠতে যাবেন এমন সময় শওকত তাকে আরো দু'একদিন থেকে যাওয়ার অনুরোধ করে। শওকতের অনুরোধ হোসেন সাহেব ফেলতে পারেন না। তিনি আরো দু'একদিন থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। রিকশা চালককে মালপত্র নামানোর নির্দেশ দেন।

শওকতের মাথায় শিক্ষামেলার পোকা ঢোকে। সে বিজয়দিবসকে কেন্দ্র করে গ্রামে শিক্ষামেলার আয়োজন করতে চায়। এ বিষয়ে কথা বলার জন্য সে যূথীর কাছে যায়। যূথী জানতে চায় শিক্ষামেলায় কী কী থাকবে। কিন্তু শওকত নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারে না। তবে সে চায় প্রতি বছর ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়দিবস উপলক্ষে স্কুলকে কেন্দ্র করে গ্রামে একটা উৎসব হোক। ছেলেমেয়েরা সেই উৎসবে ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে অংশগ্রহণ করবে। শওকত বলে, আমার কাছে টাকা থাকলে গ্রামের গায়কদের বলতাম, পুতুল নাচের ব্যবস্থা করতাম। দারুণ হতো। যূথী তার বাবাকে বলে টাকার ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। শওকত বলে, তিনি কী রাজি হবেন। যূথী ভরসা দেয় তার মন মেজাজ বুঝে কথাটা পাড়তে পারলে তিনি নিশ্চয়ই রাজি হবেন। যূথীর মন মেজাজ এখন ভাল বুঝে শওকত ফরিদের ব্যাপারটা পাড়তে চায়। বলে, তোমার নিজের মেজাজ ঠিক থাকলে তোমাকে কিছু বলতাম।

যূথী তৎক্ষণাৎ বলে, আপনার বন্ধুর বিষয়ে?

শওকত বলে, হ্যাঁ অসম্ভব ভাল একটা ছেলে। তার বাবাকে তো তুমি দেখেছ। হোসেন সাহেব। চমৎকার মানুষ। এমন একটা পরিবারে বউ হিসেবে যেতে পারা ভাগ্যের ব্যাপার।

যূথী খুবই বিরক্ত হয়। শওকতের ওপর তার ভীষণ রাগও হয়। সে বলে, সে ভাগ্যের আমার দরকার নাই। ঐ প্রসঙ্গ থাক। ঐ প্রসঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগছে না।

শওকত বলে, তোমার সমস্যাটা কী?

যূথী শওকতের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। পৌষের সকালে যেমন মিষ্টি রোদ ওঠে তার মুখে তেমনি একটা আভা ছড়িয়ে পড়ে। সলজ্জ হেসে সে বলে, আমার পছন্দের একজন মানুষ আছে। তার সাথে যদি বিয়ে হয় তা হলে বিয়ে করবো। না হলে বিয়ে করবো না।

পছন্দের মানুষটা কে?

তা আপনাকে বলতে চাই না।

সে পুনরায় শিক্ষা মেলার আলোচনায় ফিরে আসে। সে বলে, আচ্ছা কবির লড়াইয়ের আয়োজন করা যায় না? কবির লড়াই হোক না।

রাতে আমিন সাহেব খেতে বসলে যূথী তার বাবাকে শিক্ষামেলার খরচ দেওয়ার জন্য আবদার করে। আমিন সাহেব প্রথমে রাজি হন না পরে মেয়ের কথায় তিনি সম্মত হন।

মজিদকে খুঁজতে শওকত জঙ্গলে যায়, খুঁজে বের করে। শওকত মজিদকে পাখি শিকার বাদ দিয়ে অন্য কিছু করার পরামর্শ দেয়। যে কাজ করলে সংসারের অভাব দূর হবে সেই কাজ মজিদ যেন করে। কিন্তু মজিদ বলে সে পাখি শিকার ছাড়া অন্য কোনো কাজ জানে না। শওকত তাকে কাজ শেখার পরামর্শ দেয়। মজিদ বলে, আমি অনেক বড় বংশের ছেলে। আমার পক্ষে তো যে সে কাজ করা শোভা পায় না। অন্য দশ জনের মতো আমি তো আর মাটি কাটতে পারি না। শওকত বলে, তোমার বড় একটা সংসার। বৃদ্ধা মা, দুইটা বাচ্চা। তোমার জায়গায় আমি যদি থাকতাম কোনো কাজ না পাইলে অবশ্যই আমি মাটি কাটতাম। কুলির কাজ করতাম। একটি ঘুঘু পাখির খাঁচা নিয়া জঙ্গলে একা একা বইসা থাকতাম না। বলে শওকত চলে যায়।

শওকত চলে যাওয়ার সাথে সাথে মজিদ খাঁচা খুলে ঘুঘু পাখি ছেড়ে দেয়।

পরদিন সকালে মজিদ কোদাল টুকরি নিয়ে রওনা দেয় মাটি কাটার জন্য। তার বৃদ্ধা মা চিৎকার দিয়ে ওঠে, কি সর্বনাশের কথা। আমার ছেলে মাটি কাটব। অতবড় বংশের ছেলে- হাতে কোদাল। বাপধন, তরে এই বুদ্ধি কোন দুশমনে দিছে ? তুই আমার কথা শোন। তুই পাখি ধরগা যা। পাখি ধরার মধ্যে ইজ্জত আছে।

মজিদ মায়ের কথায় কান না দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

যূথী ছুটে যায় শওকতদের বাড়ি। তার বাবা শিক্ষামেলার খরচ দিতে রাজি হয়েছে এই খবরটা শওকতকে দিতে যায়। গিয়ে দেখে শওকত বাড়ি নেই। অগত্যা যূথী খালাকে বলে, শওকত ভাই আসলে বলবেন, বাবা শিক্ষামেলার খরচ দিতে রাজি হয়েছেন। খালা যাই।

যাবা কেন ? বস মা। তুমি শওকতকে বলবা সে যেন নীলাকে আসার জন্য খবর পাঠায়।

নীলাকে কেন প্রয়োজন ?

নীলার সাথে শওকতের বিবাহ তাই সে যত ঘন ঘন আসে ততই ভাল।

খালার মুখে এই কথা শুনে নীলার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। বুকের ভেতরের হৃৎপিণ্ডটা কেউ যেন চেপে ধরেছে। সে দ্রুত শওকতদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

জোছনার ফুল

ষোল

স্কুলে নতুন শিক্ষক এসেছেন। তাঁর নাম আশরাফউদ্দিন খান। স্কুলে এসেম্বলি শুরু

হয়েছে। প্রধান শিক্ষক সাহেব নতুন শিক্ষককে ছাত্রদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন তারপর তিনি আগামী ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়দিবসে যে সব অনুষ্ঠান হবে তার দায়িত্ব আশরাফউদ্দিন খানকে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দেন। ছাত্ররা হাততালি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে। এবার শওকত কথা বলে, তোমরা নিশ্চয়ই জান, স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের গ্রামের দুই মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে শহীদ হয়েছেন ঢাকার ছেলে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আহসানুল করিম। তাঁর কবরও এই গ্রামে আছে। শহীদ মুক্তিযোদ্ধা জনাব আহসানুল করিম সাহেবের বাবা-মাকে আমি মহান বিজয় দিবসের উৎসবে নিমন্ত্রণ করেছি। তাঁরা আসবেন। ছেলের কবর জিয়ারত করবেন। এই দুই বিশিষ্ট অতিথির দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমাদের আরেক সহকর্মী রেহানাকে। ছাত্ররা পুনরায় হাততালি দেয়। শওকতের কথা শেষ হলে প্রধান শিক্ষক সাহেব আগামীকাল শুক্রবার ছুটির দিনটিকে কাজে লাগানোর জন্য সবাইকে সকাল সকাল চলে আসার কথা বলে এসেম্বলি শেষ করেন।

পরদিন ছাত্ররা সবাই সকাল সকাল চলে আসে। নতুন শিক্ষক আশরাফউদ্দিন খান তাদের নিয়ে শহীদদের কবরস্থান পরিষ্কারের কাজে লেগে যান। সাথে এসে যোগ দেয় পাখি শিকারি মজিদ। সে আশরাফউদ্দিন খানকে বলে, আরো লোক লাগলে সে নিয়ে আসবে। যে কোনো ভাল কাজের সাথে সে আছে। আগে এলাকার অবস্থা এমন ছিল না। শওকত স্যার সবাইকে স্কুল ও এলাকার কাজে এক হয়ে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন।

বিজয় দিবসের প্রাক্কালে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সকল সদস্য সভায় উপস্থিত হয়েছেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় বিজয়দিবস উপলক্ষে স্কুলের মাঠে মওলানা সাহেব গ্রামের সবাইকে নিয়ে একটা মুনাজাত করবেন। মুনাজাতে শহীদদের জন্য, তাদের আত্মীয়স্বজনদের জন্য, এই অঞ্চলের মানুষের জন্য, স্কুলের জন্য এই দেশের জন্য দোয়া করা হবে। ম্যানেজিং কমিটির একজন সদস্যের প্রস্তাবে শহীদ স্মৃতি পাঠাগার গঠনের সিদ্ধান্তও হয়। অন্য একজন সদস্য এর জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা দেওয়ারও অঙ্গীকার করেন।

গ্রামে বিজয়দিবস পালিত হচ্ছে, একটা উৎসব উৎসব ভাব। কিন্তু আমিন সাহেবের মনে শান্তি নেই। মেয়ের বিবাহ নিয়ে তিনি খুবই দুশ্চিন্তায় আছেন। ম্যানেজিং কমিটির সভা শেষে হাঁটতে হাঁটতে তিনি ব্যাপারটা নিয়ে শওকতের সাথে আলাপ করেন। শওকত তাকে জানায় যে যূথীর নিজের একটা পছন্দ আছে। এমন কথাই যূথী তাকে বলেছে। কিন্তু আমিন সাহেব তা মানতে রাজি নন। তার পছন্দই যদি থাকে তাহলে সে প্রথমবার বিয়েতে সম্মত হয়েছিল কেন ? আমিন সাহেব মনে মনে ঠিক করেন যূথী

গাতকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাবীব মিয়া শওকতের বাড়ি আসে। মনসুরকে দরজার বাইরে রেখে সে শওকতের ঘরে গিয়ে বসে। হাবীব মিয়া শওকতকে বলে, লোকজন আমার ওপর ঝাপ দিয়ে পড়েছে, ইলেকশন করতে হবে। তোমার স্কুলের ইলেকশন। চিয়ারম্যান। আমিও চিন্তা কইরা দেখলাম সারা জীবন ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়া থাকলাম, পাবলিকের কামতো কিছুই করলাম না। পাবলিকের কামতো কিছু করা দরকার। দরকার না ?

জ্বি দরকার।

এখন তুমি আমারে বলতো ম্যানেজিং কমিটি বিষয়টা কী ?

প্রতি দু'বছর পরপর স্কুল ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন হয়। ম্যানেজিং কমিটির দায়িত্ব হলো...

দায়িত্ব বাদ দাও। ইলেকশন কীভাবে হয়। কী সমাচার এইটা বল।

কমিটিতে থাকেন ১১ জন। একজন চেয়ারম্যান। স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদাধিকার বলে মেম্বার সেক্রেটারি। অভিভাবকদের ভেতর থেকে থাকেন তিনজন... বাকিদের নেওয়া হয়ে শিক্ষক এবং বাইরে থেকে।

বুঝলাম।

আপনি কী সত্যিই ইলেকশন করবেন ?

গ্রামবাসী আমারে যেভাবে চেপে ধরেছে। আমারতো উপায় নাই। গ্রামের যে গাতক সে এর মধ্যে আবার এক গানও লিখে ফেলেছে।

কী গান ?

হাবীব মিয়া মনসুরকে ডাকে। মনসুর ঘরে ঢোকে। তাকে গান বলতে বলে। মনসুর রোবটের মতো বলে যায়,

কি আনন্দ ঘরে ঘরে
হাবীব ভাই ইলেকশন করে।
শুকনা গাছে পুষ্প ধরে
আনন্দ রাখনের জায়গা নাই
ও হাবীব ভাই

আমিন সাহেব ঠিক করেছেন তিনি স্কুল ম্যানেজিং কমিটিতে আর থাকবেন না। গ্রামের লোকের মুখে মুখে খবরটা ফিরে। আমিন সাহেবের এই সিদ্ধান্তটা যূথীর একদম পছন্দ হয় না। সে বিষয়টা নিয়ে আমিন সাহেবের মুখোমুখি হয়।

যূথী বলে, তোমার ইলেকশন করা দরকার বাবা।

না। আমার আর ভাল লাগে না।

তুমি ইলেকশন না করলে ঐ হাবীব মিয়া স্কুলের চেয়ারম্যান হবে। সেটা কী ভাল হবে ?

জানি না। তুমি খুব জ্বালাতন কর। যাও এখান থাইক্যা।

যূথী খুব ব্যথিত হয়। হাবীব মিয়াকে নিয়ে সে দুশ্চিন্তায় পড়ে যায়।

আমিন সাহেব সত্যিই কী ম্যানেজিং কমিটিতে থাকছেন না এটা যাচাই করার জন্য হাবীব মিয়া আমিন সাহেবের বাড়ি যায়। আমিন সাহেব পুকুরে ছিপ ফেলে বসে আছেন। হাবীব মিয়া দৌড়ে গিয়ে তার পা ধরে সালাম করে। তারপর বলে, চাচা আমি শুনছি যে, আপনে আর স্কুল কমিটির মধ্যে থাকবেন না বলে মনস্থ করেছেন। আমাদের একটা বিরাট আফসোস। যাই হোক আপনার বয়সও হয়েছে। বিশ্রামের সময়। এখন নিজের মনের আয়েশ মিটায়ে আনন্দ করবেন। ঝামেলায় যাওয়ার কোনো দরকার নাই... আমরা আছি। আপনে পথ দেখাবেন আমরা সেই পথে...

এত কথা বলতেছ কেন? মাছ মারতেছি, দেখ না।

হাবীব মিয়া জিহবায় কামড় দেয়। চাচা যাই। 'আসসালামুআলাইকুম' বলে সে ধীরে ধীরে সেখান থেকে চলে যায়।

ইলেকশনের দিন যত ঘনিয়ে আসে হাবীব মিয়ার উত্তেজনা তত বাড়তে থাকে। সে একদিন গিয়ে মওলানা সাহেবকে ধমক দিয়ে আসে। জুম্মাবারে মওলানা সাহেব যদি তাকে ভোট দেওয়ার জন্য না বলে তাহলে সে মওলানা সাহেবকে গ্রাম ছাড়া করবে বলে শাসায়। মওলানা সাহেব মোটেই ভীত লোক নন। জুম্মাবারে তিনি ইলেকশন নিয়ে কথা বলেন, জনাব দু'টা কথা বলব। আমাদের নবীজী শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। নবীজী বলেছেন শিক্ষার প্রয়োজনে সুদূর চীন মুল্লুকে যাও। আমাদের এখানে যে প্রাইমারি স্কুল আছে সেটা আমাদের প্রাণস্বরূপ। এই স্কুলকে নিয়ে আমাদের স্বপ্নের শেষ নেই। স্কুল ম্যানেজিং কমিটির ইলেকশন সামনে। আপনাদের কাছে আমার আরজ, আপনারা কমিটিতে সৎ মানুষ, ভাল মানুষ এবং কর্মী মানুষ নির্বাচন করবেন। দুষ্টুদের স্থান যেন না হয়।

আঠার

শেষ পর্যন্ত আমিন সাহেব স্কুল ম্যানেজিং কমিটিতে থাকতে রাজি হলেন। সেই সুবাদে ইলেকশনে হেরে গেল হাবীব মিয়া। তার মন-মেজাজ খুবই খারাপ। সে বসে বসে মনসুরের সাথে গজর গজর করছে। হাবীব মিয়ার দুই সন্তান-এক পুত্র, এক কন্যা স্কুলে পড়ে। তারা স্কুলে যাবার জন্য বের হচ্ছে। হাবীব মিয়া তাদের স্কুলে যেতে দেয় না। ধমকে বলে, যা বাড়িতে গিয়ে বইস্যা থাক। স্কুলে আমি আমার সন্তান পাঠাব না।

ফাজিলের স্কুল।
মনসুর বলে, এরা লেহাপড়া করব না ?
প্রয়োজনে নতুন স্কুল দেব। সেই স্কুলে সন্তান পাঠাব।
বুদ্ধি খারাপ না।
স্কুলের জন্য জমি দেখ। মনস্থির করে ফেলেছি, দিব একটা স্কুল। বাচ্চা দু'টিকে আরেকটা ধমক দিয়ে ভেতর যেতে বলে হাবীব মিয়া। তারা যায় না। মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। স্কুলের ঘণ্টা বাজে। বাচ্চা দু'টিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাদের মা এগিয়ে আসে। তাদের জিজ্ঞেস করে, কী স্কুলে যাস না ?
মেয়েটা জবাব দেয়, বাপজান স্কুলে যাইতে মানা করেছে।
কেন ?
জানি না।

হাবীব মিয়ার চেয়ে তিনগুণ উৎসাহ নিয়ে স্কুলের জন্য জমি মাপামাপি শুরু করে মনসুর। ঐ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে মজিদ। সে এগিয়ে যায়। জমি মাপার কারণ জিজ্ঞেস কের। মনসুর জবাব দেয়, নতুন প্রাইমারি স্কুল হইতেছে। স্কুলের নাম হাবীব উল্লাহ প্রাইমারি স্কুল।

প্রধান শিক্ষক সাহেব স্কুলের নতুন ম্যানেজিং কমিটির সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে নতুন কমিটির প্রথম সভা শুরু করেন। এই কমিটিতে নতুন দুই জন সদস্য আছেন। একজন মজিদের স্ত্রী রাহেলা আর অন্যজন আগের প্রধান শিক্ষক সাহেবের স্ত্রী। প্রথম সভায় স্কুলের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা হয়। প্রথমেই উঠে আসে কিছু দিন পড়াশোনার পরে ছাত্ররা আর স্কুলে আসে না। তাদের স্কুলে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব নতুন নির্বাচিত সদস্যদের ওপর পড়ে। তারা এর কারণ খুঁজে বের করবে এবং তাদের স্কুলে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা নেবে। শওকত জানায় শহীদ স্মৃতি মুক্তিযোদ্ধা আহসানুল করিমের বাবা প্রয়োজনীয় ইট, রড, সিমেন্ট পাঠিয়েছেন। নতুন কমিটি এসে কাজ করবে। তাই শওকত কিছু করেনি। সে একা কিছু করতে চায় না। এই সভাতেই মওলানা সাহেবের কাছ থেকে জানা যায় হাবীব মিয়া নতুন স্কুল দিচ্ছে। স্কুলের নাম হাবীব উল্লাহ প্রাইমারি স্কুল।
এই সংবাদ পেয়ে সবাই হতভম্ব হয়ে যায়।

ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মজিদের স্ত্রী রাহেলা বেগম তার কাজ শুরু করে দেয়। স্কুল বন্ধ করে দেওয়া ছেলেমেয়েদের বাড়ি বাড়ি যেতে শুরু করে। প্রথম দিন সে যায় আমিনার বাড়ি। আমিনার মাকে অনেক বুঝিয়ে সে রাজি করায়, পরদিন থেকে

আমিনা স্কুলে যাবে। আমিনার বাপকে বোঝানোর দায়িত্ব তার মায়ের। দ্বিতীয় দিন রাহেলা যায় হাবীব মিয়ার বাড়ি। হাবীব মিয়ার স্ত্রী তাকে চা বিস্কুট দিয়া আপ্যায়ন করে। রাহেলা এখন যেখানেই যায়, স্কুল কমিটির মেম্বার হিসেবে আলাদা খাতির যত্ন ও সম্মান পায়। রাহেলা জিজ্ঞেস করে, এরা মূর্খ হইয়া থাকবে ?

হাবীবের স্ত্রী বলে, উনি বলেছেন অন্যের স্কুলে আমার পুলাপান পড়বে না। স্কুল দিতেছি। সেই স্কুলে পড়বে।

ঠিক আছে স্কুল যখন হবে তারা বাবার স্কুলে পড়বে। স্কুল না হওয়া পর্যন্ত আমরার সবের যে স্কুল, সেই স্কুলে যাক।

তার বাপের রাগতো বইন তুমি জান।

উনার রাগ বেশি- আমি জানি। আবার আপনার যে অনেক বুদ্ধি এটাও জানি। আপনি বুদ্ধি খাটাইয়া কিছু করেন। এই গ্রামে আরেকটা স্কুলের দরকার নাই। এইটা তারে বুঝান।

আমি কিছু বললে কাজ হবে না, এই গ্রামে একজন মানুষ আছে যে বললে কাজ হবে। তারে দিয়া বলান।

আপনে কার কথা কইতাছেন?

আমিন চাচাজি। চাচাজির কথা সে ফেলবে না। সে ব্যবসা শুরু করছিল চাচাজির টাকা দিয়া। মানুষ হিসেবে সে ভাল না, কিন্তু চাচাজির উপকারের কথা সে মনে রাখছে।

আচ্ছা আমি চাচাজিকে দিয়া বলাব। যূথীরে বললেই সে ব্যবস্থা করে দিবে।

আমিন সাহেব হাবীব মিয়াকে ডেকে পাঠান। ইয়াকুব গিয়ে খবর দিয়ে আসে। হাবীব মিয়া আসে আমিন সাহেবের সাথে দেখা করতে। আমিন সাহেব বলেন,

হাবীব উই পোকা চিন ?

উই পোকা কেন চিনব না।

উই পোকার যখন পাখা ওঠে তখন তার মৃত্যু হয় জান না ?

জানি।

ক্যান মৃত্যু হয়, তা জান ?

না।

উই পোকা জন্মান্ধ। পাখা উঠনের পর সে বেদিশা হইয়া উড়াউড়ি করতে থাকে। অন্ধ বইলা বুঝতে পারে না উড়াল দিয়া কোথায় যাইতেছে। ফলে মৃত্যু।

চাচাজি আপনার কী ধারণা আমি উই পোকা ?

আমার সেই রকমই ধারণা। উইপোকা যেমন অন্ধ। তুমিও অন্ধ। তুমি বুঝতে পারতেছ না চাইর পাশে কি ঘটতাছে। এই দিকে তোমার আবার কিছু টাকা পয়সাও হইছে।

অর্থাৎ পাখাও গজায়েছে।

স্কুল দেওয়া কী দোষের ?

দোষের না। অতি বড় কাজ। কিন্তু বড় কাজের পিছনের উদ্দেশ্যটা যখন খারাপ থাকে তখন কাজটাও খারাপ হয়ে যায়। বুঝতেছ ?

হাবীব মিয়া এর কোনো প্রতি উত্তর করে না। চুপ করে থাকে। আমিন সাহেব আবার বলেন তোমার টাকা ছিল না, টাকা হয়েছে। এখন তুমি চাইতেছ মান সম্মান, মর্যাদা। তুমি যা শুরু করেছ তা দিয়া মান সম্মান কিছুই পাইবা না। বরং মানুষের হাসির পাত্র হইবা। সেইটা তুমি চাও ?

না চাই না।

তাহলে মানুষের জন্য অন্তর থাইক্যা কিছু করার চেষ্টা কর।

চাচাজি আমি কী করব। অন্তর থাইক্যা আমার কিছু আসে না। আমার ইচ্ছা করে সবেরে ধরে থাপ্পড় দেই।

আগে নিজেরে বদলাও। তুমি লোক খারাপ না। লোক ভাল। অন্যরা এইটা জানে না। আমি জানি। তুমি যা বল মুখে মুখে বল। তোমার অন্তর পরিষ্কার।

আমিন সাহেবের এই কথায় হাবীব মিয়া আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে। সে বলে, এই রকম সুন্দর কথা আমারে নিয়া কেউ বলতে পারে এইটা আমি চিন্তাই করি নাই। চাচাজি দোয়া করবেন। আমি যেন নিজেকে বদলাইতে পারি। সে উঠে আমিন সাহেবকে পা ছুঁয়ে সালাম করে।

উনিশ

গফুরের মেয়ে হয়েছে। তাতে সে খুব খুশি। খবরটা প্রথমে পায় রাহেলা। খবরটা পাওয়ার সাথে সাথেই সে দেখতে যাবে বলে স্থির করে। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় দেখে মজিদ দাওয়ায় বসে বসে মাছ মারার জাল বুনছে। স্ত্রীকে বেরিয়ে যেতে দেখে মজিদ ভাবে সে স্কুলের কোনো কাজে বের হচ্ছে। স্ত্রীর মুখে যখন শুনতে পায় সে গফুরের বাড়ি যাচ্ছে তার নবজাতক কন্যা সন্তানকে দেখতে, তখন মজিদ মনে মনে আরো খুশি হয়ে ওঠে। তার স্ত্রী আগ্রহ নিয়ে স্কুলের কাজ করছে। এলাকার কাজ করছে ভাবতে তার ভাল লাগে। সে স্ত্রীকে বলে সে যেন স্কুল ম্যানেজিং কমিটির মিটিং একদিন তার বাড়িতে করে এবং সাধ্য অনুযায়ী সকলকে খাওয়ায়। মজিদের প্রস্তাব শুনে রাহেলা বেশ আনন্দিত হয়ে ওঠে, সে নিজেও ব্যাপারটি ভাবছিল মনে মনে।

রাহেলা গফুরের বাড়ি এসে ঢোকে। তাকে দেখা মাত্র গফুর চেঁচিয়ে ওঠে, আমরার স্কুল কমিটির মেম্বর আসছে। তাড়াতাড়ি কন্যা দেখাও। মেয়ে এনে দেখানো হয়। রাহেলা মেয়ে কোলে নেয়। খুশিতে তার চোখ মুখ হাসে, সে বলে, পরীর মতো সুন্দর মেয়ে, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ্'। এই মেয়ে একদিন বড় হইব। বই খাতা নিয়া স্কুলে যাইব। এর মধ্যে মিষ্টি আসে। রাহেলা মিষ্টি খায়। তারপর সে গফুরকে শিশুর জন্ম নিবন্ধন করানো ও টিকা দেওয়ার কথা বলে। বাচ্চার মাকে ভালমন্দ খাওয়াতে হবে। মা সুস্থ থাকলে বাচ্চা সুস্থ থাকবে। নিজেরাও যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। গফুর ও তার স্ত্রী রাহেলার সব উপদেশ মান্য করবে বলে আশ্বাস দেয়। খুশি মন নিয়ে রাহেলা গফুরের বাড়ি থেকে বের হয়।

গ্রামের কোনো কোনো টিউবওয়েলে আর্সেনিক থাকতে পারে এই আশঙ্কা থেকে শওকত সবগুলো টিউবওয়েলের পানি পরীক্ষার জন্য শহরে পাঠিয়েছে। দেখা যায় তার অনুমান মিথ্যা না। অনেকগুলো টিউবওয়েলের পানিতেই আর্সেনিক পাওয়া যায়।

শওকত ও রেহানা গ্রাম ঘুরে ঘুরে আর্সেনিক যুক্ত টিউবওয়েলগুলোর মুখে লাল রং লাগিয়ে দিচ্ছে। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় হাবীব মিয়া ব্যাপারটা লক্ষ্য করে। সে এগিয়ে গিয়ে তাদের কাছে ব্যাপার জানতে চায়। শওকত সবিস্তারে তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে। সে তার নিজের বাড়ির টিউবওয়েলের অবস্থা জানতে চায়। শওকত বলে সেটা ভাল আছে। তারটা সহ মোট ২টা টিউবওয়েলের পানি ভাল পাওয়া গেছে। শওকত ও রেহানার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাবীব মিয়া নিজের পথ ধরে। কিছুদূর এগিয়ে যেতেই সে মুখ লাল রং করা একটা টিউবওয়েলের দেখা পায়। একটা মেয়ে পানি নিচ্ছে। হাবীব মিয়া মেয়েটিকে ওই কলের পানি না নেওয়ার জন্য বলে, ফালাও পানি। এই পানি খাওয়া নিষেধ। লাল রং দেখতেছ না। যে টিউবওয়েলের মুখে লাল রং সে টিউবওয়েলের পানি হইল বিষ। যাও আমার বাড়িতে যাও। আমার বাড়ির টিউবওয়েল ঠিক আছে। মেয়েটা পানি না নিয়ে চলে যায়। হাবীব মিয়া মনসুরকে বলে, স্কুলের মাস্টাররা খালি যে স্কুল দেখে তা-না। অনেক কিছুই করে।
স্কুল ম্যানেজিং কমিটিতে যারা আছে তারাও অনেক কাজ করে।
আমি যে ইলেকশনে ফেল করছি, ভালই হয়েছে। আমিতো কোনো কাজের লোক না। পানি পরীক্ষার কথা আমার মনেই আসত না।
ঠিকই বলেছেন, আপনে কমিটিতে থাকলে আমরার বিপদ ছিল। আল্লাহ্ যা করেন ভালর জন্যেই করেন।
মনসুরের মুখে এই কথা শুনে হাবীব মিয়ার মাথার তালু গরম হয়ে ওঠে। সে বলে, কী কথা বলতেছ খিয়াল আছে? একটা থাপ্পড় দিয়া... তুমি আসবা না আমার সাথে, ফাজিল।

মনসুর দাঁড়িয়ে থাকে। হাবীব মিয়া এগিয়ে যায়। কিছু দূর গিয়ে সে মনসুরকে ছাতা ধরার জন্য ডাকে।

স্কুলের টিউবওয়েলেও আর্সেনিক পাওয়া গেছে। সমস্যাটা নিয়ে ম্যানেজিং কমিটির মিটিং-এ আলোচনা হয়। নতুন জায়গায় গভীর নলকূপ বসানোর জন্য বলেন আমিন সাহেব। এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও তিনি দেবেন। আরো দুটি সমস্যা নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। স্কুলটি প্রাইমারি স্কুল। প্রাইমারি পাশ দেওয়ার পর ছেলেমেয়েদের বসে থাকতে হয়। হাই স্কুল অনেক দূরে। বেশি সমস্যা হয় মেয়েদের। এই বিষয়টা নিয়ে পরের মিটিং-এ বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। আজ আমিন সাহেব বেশিক্ষণ থাকতে পারবেন না। যূথীর জ্বর।

অন্য সমস্যাটি হলো। জন্মের পর শিশুর নাম রেজিস্ট্রিকরণ। শওকত শিশু জন্মের পর পাকা খাতায় তার জন্ম তারিখ, দিনক্ষণ নাম ইত্যাদি লিখে রাখার প্রস্তাব করে। আমিন সাহেবের বেশ পছন্দ হয় ব্যাপারটি। জন্ম নিবন্ধন পদ্ধতি চালু করার সিদ্ধান্ত হয় সভায়।

হাবীব মিয়া গ্রামশুদ্ধ লোককে খবর দিয়ে আসে তার টিউবওয়েলের পানি ভাল। লোকের লাইন লেগে যায় তার বাড়িতে। কলের ঘটাং ঘটাং শব্দে তেষ্টানো দায়। মেজাজ খারাপ হয়ে যায় তার। সে চিল্লাবাল্লা শুরু করে। মদিনা নামের একটা মেয়ে পানি নিতে আসে তাকে ধমকিয়ে বিদায় করে দেয়।

কিছুক্ষণ পর তার মেজাজ ভাল হয়ে যায়। সে কলতলায় যায়। ওজু করে। মাথায় টুপি পরে। বালতিতে পানি ভরে মদিনাদের বাড়ির পথ ধরে। হাবীব মিয়া নিজে পানির বালতি বহন করে নিয়ে এসেছে দেখে মদিনা হতভম্ব হয়ে পড়ে। তার মুখ দিয়ে কোন কথা সরে না।

শওকতকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে যূথীর। কিন্তু কোনো কাজ ছাড়াতো শওকত দেখা দেওয়ার পাত্র নয়। মনে মনে মতলব আঁটে সে। সবাইকে বলে তার ভীষণ জ্বর।

যূথীর জ্বরের কথা শুনে শওকত তাকে দেখতে যায়। কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে যূথী। তার জ্বর কতটা তা নির্ণয় করার জন্য শওকত থার্মোমিটার চায়। যূথী বলে থার্মোমিটার ছাড়াওতো জ্বর দেখা যায়। কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখা যায় না ? রুগীর কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখলে দোষ হয় না। শওকত যূথীর কপালে হাত দিয়ে থ বনে যায়। একটুও জ্বর নেই। খিল খিল করে হেসে ওঠে যূথী। কম্বল ছেড়ে সে উঠে বসে। বলে, এমনেতো আপনি আমারে দেখতে আসেন না। অসুখ-বিসুখ হলে আসেন। তাই ভান ধরে সবাইরে বলেছি, আমার আকাশ-পাতাল জ্বর।

ও আচ্ছা।
আপনি তো আবার মিথ্যা কথা বলা পছন্দ করেন না। আপনাকে দেখতে ইচ্ছা করছিল এই জন্য মিথ্যা বলেছি। আমাকে মাফ করে দিবেন।
তোমার কথাবার্তা ঠিক- মানে-
আমার কথাবার্তা বুঝতে পারতেছেন না ? কপট রাগ দেখিয়ে যূথী বলে, বুঝতে না পারারই কথা। বুঝতে পারলে অনেক আগেই বুঝতেন। এখন মনে হয় সত্যি সত্যি আমার জ্বর এসেছে। দেখেন তো আবার কপালে হাত দিয়ে। যূথীর কথা ও আচরণে শওকত খানিকটা বিব্রত, বিস্মিত ও লজ্জিত বোধ করে। এই প্রথম যূথীর ব্যবহারে অন্য কিছু খুঁজে পায় শওকত।

বিশ

স্কুলে এসেম্বলি বসেছে। জাতীয় সংগীত হচ্ছে। দু'টি ছেলে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে। দেখে প্রধান শিক্ষক ও শওকতের ভ্রু কুঁচকে যায়। জাতীয় সংগীত শেষ হলে প্রধান শিক্ষক ছেলে দু'টিকে কষে ধমকে দেন। শহীদ নামের ছেলেটি বলে সংগীত শুনলে তার হাসি পায়। শওকত বলে, সংগীত শুনলে হাসি আসবে কেন ? যাই হোক পরে তোমার কাছ থেকে কারণ জানব। এখন আমার শক্ত কথা শোনো, জাতীয় সংগীত যখন হবে তখন তোমরা সেই সংগীতকে যথার্থ মর্যাদা দেবে। এর যেন কোনো উনিশ বিশ না হয়। আচ্ছা তোমরা যাও। ছাত্ররা ক্লাসে চলে যায়। টিচার্স কমনরুমে এখন একটাই আলোচনা। ঘন ঘন স্কুল ভিজিট হচ্ছে কেন ? এক সপ্তাহ আগে উপজেলা শিক্ষা অফিসার স্কুল ভিজিট করে গেছেন- এখন আবার জেলা শিক্ষা অফিসার আসছেন ব্যাপার কী ? এই নিয়ে জল্পনা কল্পনা। কেউ বলছে স্কুলের কর্মকাণ্ড ঠিক মতো হচ্ছে কি না তাই দেখতে আসছেন। কেউ বলছেন অন্য ঘটনা। তদন্ত চলছে। এইসব নানা কথা। কেউ কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না। অনুমানের ওপর নির্ভর করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাও যায় না।

নিজের ভেতর উত্তেজনা আর ধরে রাখতে পারে না হাবীব মিয়া। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর কাছে ব্যাপারটা সে প্রকাশ করে ফেলে। সে স্ত্রীকে বলে, শওকত মাস্টারের মান সম্মান এবার গেল। বিষয় হচ্ছে তার নামে চিঠিপত্র গেছে ওপরে। ক্লাসে ভালমত পড়াতে পারে না। স্কুল ঠিকমত চালাতে পারে না। ছাত্রদের প্রধান কাজ পড়ালেখা। সে তা বাদ দিয়ে অন্য কিছু করে বেড়ায়। ছাত্রদের বেগার খাটায়। স্কুল পরিষ্কার করে। রাস্তা পরিষ্কার করে হেনতেন। আজ শিক্ষামেলা তো আগামীকাল ভ্যারাইটি শো, পরশু গান

বাজনার আসর। স্কুলের টাকা পয়সাও এইদিক ওইদিক।
হাবীবের কথা শুনেই তার স্ত্রী বুঝতে পারে এইসব তারই কারসাজি। সে খুব খারাপ লোক। মানুষের ভাল সে দেখতে পারে না। স্ত্রী তাকে এইসব বন্ধ করার পরামর্শ দেয়। না হলে সে নিজেই ব্যবস্থা নেবে। হাবীব মিয়া বিস্মিত হয়। তার স্ত্রী আবার কী ব্যবস্থা নেবে। শেষে স্ত্রীই ব্যবস্থাটার কথা খোলাসা করে যে, সে ছেলেমেয়ে নিয়া বাপের বাড়িতে চলে যাবে। আর ফিরে আসবে না। হাবীব মিয়ার অবশ্য তাতে কোনোই আপত্তি নেই।

গ্রামের বিভিন্ন স্থানে গাছের গায়ে মাটির দেয়ালে হাতে লেখা পোস্টার চোখে পড়ে। তেমনি একটি পোস্টার দেখতে পান আমিন সাহেব। গাছের গায়ে লাগানো। তাতে লেখা- দুর্নীতিবাজ শওকত মাস্টারের অপসারণ চাই।
গ্রামবাসী।

পোস্টারটি দেখেই আমিন সাহেবের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। এই কাজ কে করেছে তার খোঁজ নিতে বলেন ইয়াকুবকে। আর পোস্টারটি ছিঁড়ে ফেলতে বলেন। তেমনি আরেকটি পোস্টার একযোগে নজরে পড়ে প্রধান শিক্ষক, শওকত ও রেহানা বেগমের। একটি মাটির বাড়ির দেয়ালে লাগানো হয়েছে পোস্টারটি। এতে লেখা আছে দুর্নীতিবাজ হেড মাস্টার [গম চোর]
শওকতের অপসারণ চাই।
জাগ্রত গ্রামবাসী।
এই পোস্টারটি দেখে তারা নিশ্চিত হয় যে, জেলা শিক্ষা অফিসার স্কুল ভিজিটে নয় তদন্ত করতেই আসছেন। এর মধ্যে ওই বাড়ির মালিক বেরিয়ে আসে। পোস্টার দেখে সে তাজ্জব বনে যায়। টান দিয়ে ছিঁড়তে যায়। বাধা দেয় শওকত। বলে, যে লিখেছে সে তার মত প্রকাশ করেছে। তার মত ভুল হলেও মত প্রকাশের স্বাধীনতা তার আছে।

জেলা শিক্ষা অফিসার হারুন সাহেব রিকশায় করে গ্রামে ঢুকছেন। তার চোখে কয়েকটা পোস্টার পড়েছে। তিনি প্রতিবারই রিকশা থামিয়ে পোস্টার পড়েছেন। ব্যাপারটা বোঝার জন্য তিনি রিকশা চালকের সাথে কথা বলেন, এই গ্রামের শওকত মাস্টারকে চেন ? স্কুলের টাকা পয়সার হেরফের করেছে।
এইটা কি বললেন ? শওকত মাস্টার চোর। আপনে ভদ্রলোক না ?
কাগজে লেখা দেখে বললাম, আমিতো আর জানি না।
কাগজে যদি কেউ লেখে আপনে চোর তাইলে কী আপনি চোর হয়ে যাবেন ? যদি লেখে আপনি সাধু তাইলে কী সাধু হইবেন ?

তোমার কথাবার্তা খুবই যুক্তিনির্ভর।

আপনে কী বলেছেন আমি বুঝি নাই। আমারে যা ইচ্ছা বলেন, শওকত স্যারেরে নিয়া কোনো মন্দ কথা বলেছেন- তাইলে কিন্তু খবর আছে।

কী করবে, আমাকে মারবে ?

রিকশা চালক এর কোনো প্রতিউত্তর করে না। সে বিরক্ত মুখে রিকশা চালাতে থাকে।

কুদ্দুসের দোকানের সামনে এসে হারুন সাহেব রিকশা থামায়। কুদ্দুসকে বলেন রিকশা চালককে বেশি করে চিনি দিয়ে এক কাপ চা দিতে। কারণ তার মেজাজ খুবই বিগড়ে আছে। চা খেয়ে যদি মেজাজ ভাল হয়। কুদ্দুস জানতে চায় তার রাগার কারণ কী ?

হারুন সাহেব শওকতকে নিয়ে পোস্টারের লেখার কথা কুদ্দুসকে বলে। কুদ্দুস বলে, যে এই কাজ করেছে তাকে যদি পাই তাহলে তার মাথায় অর্ধেক কাপ গরম চা ঢালবো। এই কথা শুনে হারুন সাহেব কিছুটা ভড়কে যান। কুদ্দুস হারুন সাহেবের পরিচয় জানতে চায়, জনাব আপনার পরিচয় ?

হারুন সাহেব বলেন, আমি জেলা শিক্ষা অফিসার। আপনাদের স্কুল ইন্সপেকশনে এসেছি। গাড়িটা বড় রাস্তায় রেখে এসেছি।

হারুন সাহেবের পরিচয় পেয়ে কুদ্দুস ও রিকশা চালক পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

স্কুলে গিয়ে শিক্ষা অফিসার প্রথমে শ্রেণী কক্ষ পরিদর্শন করেন। ছাত্রছাত্রীদের কিছু প্রশ্নও করেন। স্কুলের কিছু কাগজপত্র পরীক্ষা নীরিক্ষা করেন। এরপর তিনি স্কুলের শিক্ষকদের কাছে অনুমতি চান যে তিনি প্রধান শিক্ষক সাহেব ও শওকতের সাথে আলাদা কিছু কথা বলবেন। অন্য শিক্ষকরা সানন্দে সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে যান। শওকতকে উদ্দেশ্য করে শিক্ষা অফিসার বলেন, কেমন আছেন শওকত সাহেব ?

ভাল আছি স্যার।

আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না আপনি ভাল আছেন। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে মনের কষ্টে আছেন। ভাই শুনুন, আপনার স্কুল খুব ভালভাবে চলছে। স্কুলের কর্মকাণ্ড, গ্রামের মানুষদের সঙ্গে স্কুলের সম্পৃক্ততা চমৎকার।

বলতে গেলে আপনার একক প্রচেষ্টাতেই এতদূর হয়েছে। আপনার মন খারাপ কেন ?

শওকত কোনো জবাব দেয় না। শিক্ষা অফিসার পুনরায় বলতে শুরু করেন, এক দুইজন যদি আপনার সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলে, বা শিক্ষা দপ্তরে অভিযোগ পাঠায় তাতে কী যায় আসে ? আমাদের দেশের নিয়মটাই হলো কেউ ভাল কিছু করলে তার পেছনে লাগা। এইগুলিকে পাত্তা দিতে নাই।

শওকত বলে, স্যার, আপনি কী আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্ত করতে এসেছেন ?

অভিযোগের তদন্ত আগেই হয়েছে। আমি এসেছি অন্য কারণে। আপনি ও আপনাদের স্কুল খুব সম্ভব শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের জন্য প্রেসিডেন্ট গোল্ড মেডেল পাচ্ছেন। আমরা

আপনাকে ও আপনার স্কুলকে বাছাই করেছি। সংবাদটা এখনো গোপন। তবে আমি পেটে কথা রাখতে পারি না।

Congratulation। এইবার একটু হাসুন।

প্রধান শিক্ষক সাহেব ও শওকত হেসে ওঠেন।

জোছনার ফুল

একুশ

শওকতকে চিঠি পড়তে দেখলেই খালা ভাবে নীলার চিঠি। আজও তাই হলো। শওকত গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা চিঠি পড়ছে। খালা দৌড়ে এসে জানতে চান চিঠি নীলার কি না, সে কী লিখেছে ? খালার এই আচরণে শওকত বিরক্ত হয়। সে বলে, খালা আমি লক্ষ্য করেছি আমার হাতে কোনো চিঠি দেখলেই তুমি প্রশ্ন কর চিঠি কে লিখেছে- নীলা ? তোমার কী ধারণা নীলা প্রতি সপ্তাহে আমাকে চিঠি দেয় ? শওকতের বিরক্তি মাখা কথা শুনে খালা চলে যেতে উদ্যত হয়। শওকত তাকে ডাকে। খালা ফিরে আসে। শওকত বলে, যদি বলি চিঠিটা নীলা লিখেছে তুমি খুশি হবে ? একখান হাসি উপহার দিয়ে খুব আগ্রহ নিয়ে খালা জানতে চায় কী লিখেছে। ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটিয়ে শওকত বলে, এই চিঠিটা নীলা লিখেনি। এই চিঠি লিখেছেন আমাদের নতুন উপজেলা শিক্ষা অফিসার। তবে নীলার লেখাও একটা আছে। দাঁড়াও সেটা খুলি। শওকত খাম খোলে। খামের ভেতর থেকে বড় একটা কাগজ বেরিয়ে আসে। তার মাঝখানে লেখা 'কেমন আছেন' ? শওকত লেখাটা পড়ে ও খালাকে দেখায়। খালা আনন্দিত মুখে তাকিয়ে থাকেন। তাকে দেখেই বোঝা যায় তিনি খুব খুশি। নীলার চিঠি আসায় খালার এত খুশির কারণ জানতে চায় শওকত। খালা জানান যে, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন নীলার সাথে শওকতের বিবাহ হচ্ছে।

শওকত খালাকে বোঝায় যে, মানুষ মনে প্রাণে যা চায় তা-ই সে স্বপ্নে দেখে। খালাও মনে প্রাণে চায় নীলার সাথে শওকতের বিয়ে হোক। তাই তিনি এই স্বপ্ন দেখেছেন। শওকত খালার কাছে চা খেতে চায়। খালা চা বানাতে চলে যায়। খালা চলে গেলে শওকত ভ্রু কুঁচকে প্রথম চিঠিটা পড়ে-

হেড মাস্টার সাহেব,

আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আল্লাহতালার কৃপায় মঙ্গলমত আছেন। পর সমাচার আমি সম্প্রতি বদলি হইয়া আপনাদের এলাকার উপজেলা শিক্ষা অফিসারের দায়িত্ব নিয়াছি। স্কুলের সার্বিক অবস্থা এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শনের জন্য আমি শীঘ্রই আপনাদের এলাকায় আসিব।

আপনাদের স্কুলে ন'টা সাড়ে ন'টার মধ্যে পৌঁছিবার আশা রাখি। আশা করি দুপুর

নাগাদ আপনার স্কুল পরিদর্শনের কাজ শেষ হইবে। অতঃপর আপনার পার্শ্ববর্তী নিত্যানন্দা গ্রামের প্রাথমিক স্কুলটি পরিদর্শনে যাইব। সুতরাং সেইমতো প্রস্তুত থাকিলে বাধিত হইব। ভাল থাকিবেন। ইনশাল্লাহ শীঘ্রই দেখা হইবে।
ইতি
আকরাম হোসেন
চিঠি শেষ করে শওকত ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে।

হাতি বিক্রি করতে পাঠিয়ে দিয়ে আমিন সাহেব গম্ভীর মুখে বসে আছেন। যূথী এসে তার কী হয়েছে জানতে চায়। আমিন সাহেব বলেন, কই কিছুতো হয় নাই। আমিন সাহেব হাতি বিক্রি করে দিয়েছে কিনা তাও নিশ্চিত হতে চায় যূথী। আমিন সাহেব হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়েন। যূথী বলে, কেন ? তোমার এত শখের জিনিস।
হাতি আমার কোনো শখের জিনিস না। আমি সার্কাসের ম্যানেজার না যে আমার হাতি দরকার। হাতি কিনেছিলাম মেয়ের জামাইকে হাতির পিঠে চড়ায়ে বাড়িতে আনব। মেয়ে আছে বিবাহ নাই। আমি আছি হাতি নাই।
কোনোদিন বিবাহ করব না এমন কথা আমি বলি নাই।
কোনদিন যে করবা এমন কথাও বল নাই। তুমি অনেক যন্ত্রণা কর। আর যন্ত্রণা করবা না। সামনে থেকে যাও।
হাতিটা আমার খুব পছন্দের ছিল বাবা।
তুমি একটা তারিখ দেও। খোলাসা করে বল এই তারিখে বিবাহ করব। আমি হাতি বেচব না। রেখে দেব। বিবাহে হাতি যৌতুক দিব। কী রাজি ?
যূথী দ্রুত আমিন সাহেবের সামনে থেকে চলে যায়। তিনি যেমন গম্ভীর মুখে ছিলেন তেমনি গম্ভীর মুখেই বসে থাকেন।

গলায় ঘণ্টা ঝুলিয়ে হাতি চলে যাচ্ছে। ঢং ঢং শব্দ হচ্ছে। হাতির সাথে আছে মাহুত আর ইয়াকুব। হাবীব মিয়া পথে ছিল। হাতি দেখে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে হাতি কোথায় যায় ? ইয়াকুব জানায় মুরাদনগর। সেখানে সার্কাস পার্টি এসেছে। তারা হাতি কিনবে। হাবীব মিয়া দাম জিজ্ঞেস করে।
ইয়াকুব ত্যাড়াভাবে বলে, খামাখা দেরি করাইতেছেন। দাম দিয়া আপনার কাম কী ? হাবীব মিয়ার মাথায় হাতি কেনার পোকা ঢোকে।

নীলার চিঠির জবাব লেখে শওকত। বড় একটা কাগজের মাঝখানে লেখে ‘ভাল আছি’। চিঠিটা ভাঁজ করে খামে ভরে। আঠা দিয়ে মুখ আটকায়। সে পোস্ট অফিসের পথ ধরে।

পোস্ট বাক্সে চিঠি ফেলে রাস্তায় নেমে শওকত দেখে হাতি। হাতির পিঠে হাবীব মিয়া বসে আছে। শওকতকে দেখেই হাবীব মিয়া হাতি কেনার খবর দেয়। দাম ৪ লাখ টাকা। বেশি হয়েছে কি না জিজ্ঞেস করে। জবাবে শওকত জানায় সে হাতি কেনাবেচা করে না। সুতরাং তার দাম জানা নেই। হাবীব মিয়া বলে, দাম বেশি হইলে কিছু যায় আসে না। এইটা আমার শখের জিনিস। কথায় আছে শখের তোলা আশি টেকা। ঠিক না। শওকত বলে, জ্বি- ঠিক।

হাতি কিনে হাবীব মিয়া খুব খুশি। সে হাতির মাহুতকে বলে তার বউ রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে। মাহুত যেন হাতি নিয়ে গিয়ে বউকে নিয়ে আসে। বউয়ের রাগ ভাঙানোর জন্য হাতি পাঠিয়েছে আর কি! আগামী বছর সে চেয়ারম্যান ইলেকশন করবে। মার্কা নিবে হাতি। অবশ্য হাতি মার্কা না পেলে ক্ষতি নেই হাতি চড়ে লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট চাইবে। হাতি নিয়ে হাবীব মিয়া বাজারের দিকে চলে যায়।

হাবীব মিয়ার হাতি কেনার খবরটা গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে যায়। গ্রামের গাতক একটা গানও রচনা করে ফেলে,

এক আংগুল সারিন্দার
তিন আংগুল আশা।
সারিন্দা আইজ নিয়াছে
হাতির উপরে বাসা।
সারিন্দার নাম কী বল চাই ?
সারিন্দার নাম হাবীব ভাই।
আগুর পাগুর করে সারিন্দা
তার সুখের সীমা নাই।

আমিন সাহেব শওকতকে ডেকে পাঠান। শওকত আসে। তিনি চোখ বন্ধ করে খাটে শুয়ে আছেন। শওকত এসে তার পাশে বসে। শওকত জিজ্ঞেস করে আপনার কী শরীর খারাপ ?

শরীর ঠিকই আছে। মন আউলা। মন এমন জিনিস সে যদি আউলা হয় শরীরও হবে আউলা।

মন খারাপ কেন ?

যূথীর জন্য। তারে এখনো বিবাহ করতে রাজি করতে পারলাম না। বয়স হয়েছে। হুট করে একদিন মরে যাব। মেয়েটির কী হবে। বাদ দাও। তোমারে যে কারণে ডেকেছি সেটা বলি। হাতি বিক্রি করে দিয়েছি শুনেছ বোধ হয়।

জ্বি শুনেছি।

হাবীব কিনেছে। সে হাতি দিয়া কী করবে কে জানে। টাকা পয়সার সাথে সাথে

মানুষের বুদ্ধিও বাড়ে। হাবীবের উল্টা নিয়ম। তার টাকা যত হইতেছে বুদ্ধিও নিচের দিকে যাইতেছে। যাই হোক সেটা তার ব্যাপার, তোমারে যে কথাটা বলার জন্য ডেকেছি সেটা শোনো।

জ্বি বলেন।

হাতি বিক্রির টাকাটা আমি কোনো একটা সৎ কাজে দিতে চাই। সেটা কি খুঁজে বের কর। কিছু টাকা দিয়া আমি স্কুলের জন্য আরো দুইটা ঘর তুলে দিতে চাই। বাকিটার অন্য ব্যবস্থা কর। বিষয়টা গোপন রাখবা।

গোপন কেন ?

দাতা সাজার আমার কোনো ইচ্ছা নাই। লোকে আমারে কৃপণ জানে সেইটাই জানুক।

কৃপণ কথাটা শুনে শওকতের হাসি পেয়ে যায়। আমিন সাহেব জিজ্ঞেস করে, তুমি হাসতেছ কেন ?

শওকত বলে, আপনি মানুষটা অদ্ভুত।

আমিন সাহেব মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন, সব মানুষই অদ্ভুত। আমি অদ্ভুত, তুমি অদ্ভুত। আমাদের হাবীব মিয়া অদ্ভুত। কাল সকালে যে উপজেলা শিক্ষা অফিসার আসতেছে দেখবা সেও অদ্ভুত।

হাবীব মিয়ার শ্বশুর বাড়ি থেকে হাতি ফিরে আসে। আসার পথে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সাথে হাতির সাক্ষাৎ হয়। শিক্ষা অফিসার জানতে চায় হাতি কার। মাহুত বলে, হাবীব মিয়ার হাতি। শিক্ষা অফিসার হাবীব মিয়াকে চেনেন না। তাই জিজ্ঞেস করেন, হাবীব মিয়া কে ? মাহুত বলে দেয়, খোঁজ নিয়া জানুন। শিক্ষা অফিসার রিকশা চালককে জিজ্ঞেস করে, সে বলে নব্য ধনী।

শ্বশুর বাড়ি থেকে খালি হাতি ফিরে আসতে দেখে হাবীব মিয়ার খুব মন খারাপ হয়। তার স্ত্রী আসেনি। সে সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছে হাবীব মিয়ার পরিবর্তন না হলে সে আসবে না।

হাবীব মিয়া ভাবে পরিবর্তন হওয়া দরকার। প্রধান শিক্ষক ও শওকতের সাথে যা করেছি তার জন্যও মাফ চাওয়া দরকার।

স্কুল পরিদর্শন শেষ করেছেন শিক্ষা অফিসার আকরাম হোসেন। প্রধান শিক্ষক সাহেবের কক্ষে প্রধান শিক্ষক, শিক্ষা অফিসার, শওকত ও রেহানা বসে আছেন। শিক্ষা অফিসার জানান, স্কুল দেখে তিনি খুবই খুশি হয়েছেন। ভাল করে একটা রিপোর্ট দিয়ে দেবেন। শওকত তাকে ধন্যবাদ দেয়। টেবিলে নাস্তা দেওয়া হয়েছে। প্রধান শিক্ষক

সাহেব নাস্তা খেতে শিক্ষা অফিসারকে অনুরোধ করেন। শিক্ষা অফিসার জানান তিনি সকালে খেয়েই এসেছেন।এত আয়োজন কেন? প্রধান শিক্ষক বলেন এ আর এমন কি? গতবারতো... প্রধান শিক্ষকের কথা শেষ হয় না। শিক্ষা অফিসার বলেন- বুঝেছি। প্রধান শিক্ষক সাহেব, হাতের পাঁচটা আঙুল যেমন সমান নয়, সব মানুষও তেমনি এক রকম হয় না। আপনাদের স্কুল দেখেই আমি খুশি হয়েছি। অন্য কিছু দিয়ে আমাকে খুশি করতে হবে না।

প্রধান শিক্ষক সাহেব শিক্ষা অফিসারকে দুপুরে খেয়ে যেতে অনুরোধ করেন তাতেও তার আপত্তি। তিনি বলেন, আমার সমস্যাটা হলো অফিসের কাজে গেলে আমি কোথাও কিছু খাই না। আমাকে ছোট করবেন না। শওকত এগিয়ে এসে বলে, স্যার একটা কথা বলব, আপনাকে ছোট করব না। আমার বিশেষ অনুরোধ আপনি আমাদের সঙ্গে একটু নাস্তা খান। শিক্ষা অফিসার হেসে বলেন, আচ্ছা আসুন।

শিক্ষা অফিসার চলে গেলে শওকত মনে মনে বলে, আমি অবাক হয়েছি। খুবই অবাক হয়েছি।

বাইশ

স্কুল এক মাসের গরমের ছুটি। এসেম্বলি শেষে প্রধান শিক্ষক সাহেব এই ঘোষণা দেন। ছেলেমেয়েরা সব হৈচৈ ছুটাছুটি করছে। তাদের আনন্দের সাথে শওকতসহ শিক্ষকরাও আনন্দিত। সবারই মুখে হাসি।

স্কুলের শিক্ষক রেহানা এই অঞ্চলের মেয়ে নয়। ছুটিতে সে বাড়ি যাবে। একদিকে তার খুব আনন্দ লাগে। আবার এক মাস স্কুলে থাকবে না, সেইজন্য মনও খারাপ লাগে। স্কুলটার প্রতি তার খুব মায়া পড়ে গেছে। শওকতও ঠিক করেছে এই ছুটিতে সে ঢাকা যাবে। সেদিনের ঘটনার পর শওকত যূথীর প্রতি কিছুটা আগ্রহ বোধ করছে। সে সিদ্ধান্ত নেয় ঢাকা যাবার খবরটা সে নিজ মুখে যূথীকে দিবে।

যূথী তার পুকুর ঘাটে বসে পায়ে আলতা লাগাচ্ছে। হঠাৎ তার গায়ে ছায়া পড়ে। সে চমকে ওঠে দেখে হাসি মুখে শওকত দাঁড়িয়ে আছে। নিজেকে সামলে নিয়ে যূথী বলে, হঠাৎ আপনাকে দেখে চমকে উঠেছি। আপনি এমন নিঃশব্দে হাঁটা কার কাছে শিখেছেন? শওকত বলে, বিড়ালের কাছে। পায়ে আলতা দিচ্ছ কোনো ঘটনা আছে।

পায় আলতা দিতে ঘটনা লাগে না।

আমার বিয়েও না, গায়ে হলুদও না, মন ভাল না তাই সাজগোজ করছি। আপনি কেন এসেছেন বলেন। কোনো দরকার ছাড়া শুধু গল্পগুজব করতে আপনি আমার কাছে আসবেন না সেটা জানি।

আমি ঢাকায় যাচ্ছি। সেখানে বেশ কিছুদিন থাকব। তোমাকে এই খবরটা দিতে এসেছি।

যূথী খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে, কোথায় উঠবেন ? আপনার বন্ধু ফরিদ সাহেবের বাড়িতে ? শওকত বলে, হ্যাঁ। সাথে সাথে যূথীর চেহারায় পরিবর্তন ঘটে। আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে সে বলে, না। আপনি ঐ বাড়িতে উঠতে পারবেন না। কক্ষনো না। কোনোদিনও না। আপনি ঐ বাড়িতে উঠবেন আর নীলা হাসতে হাসতে আপনার সঙ্গে গল্প করবে এটা আমি কখনো হতে দেব না। এই বলে যূথী দৌড়ে পুকুর ঘাট ছেড়ে চলে যায়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় শওকত কী করবে বুঝে উঠতে পারে না।

পরদিন শওকত ঢাকা চলে আসে। শওকত একটা হোটেলে ঢোকে চা খেতে। ছোট ফুটফুটে একটা ছেলে চা এনে দেয়। শওকত ছেলেটার সাথে আলাপ জোড়ে। ছেলেটার নাম শামছু। সে লেখাপড়া জানে না। তবে সে এটা জানে যে লেখাপড়া জানাটা দরকার। শওকত তাকে লেখাপড়া করার জন্য বলে। শামছু জানায় কাজ করেই সময় পায় না লেখাপড়া কীভাবে করবে। শওকত ওকে বোঝায় ইচ্ছে থাকলে একটা উপায় হয়ই। ইচ্ছে থাকাটা হলো আসল। শামছুও শেষ পর্যন্ত একমত হয়।

অবসরপ্রাপ্ত হোসেন সাহেবের সারাদিন কোনো কাজ নেই। খবরের কাগজ পড়েই তিনি সময় কাটান। খবরের কাগজের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোনো কিছুই তিনি বাদ দেন না। তার এই খবরের কাগজ পড়া নিয়ে বাড়ির সবাই খুবই বিরক্ত। কথা হচ্ছে হোসেন সাহেব ও নীলার মধ্যে। এমন সময় কলিং বেল বাজে। নীলা দরজা খোলে : দরজার ওপাশে হাসি মুখে শওকত দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে খুশিতে নীলার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হঠাৎ সে লক্ষ্য করে শওকতের সাথে তার ব্যাগ স্যুটকেস এইসব কিছুই নেই। নীলা জিজ্ঞেস করে, আপনার সঙ্গে স্যুটকেস ব্যাগ এইসব কোথায় ?

একটু আমতা আমতা করে শওকত জবাব দেয়, হোটেলে রেখে এসেছি।

ঢাকায় এসে আপনি হোটেলে থাকবেন ? থাক আমাদের বাসায় আসার দরকার নেই। হোটেলে চলে যান, বলে নীলা দরজা বন্ধ করে দেয়। মরিয়া হয়ে শওকত বলে, দরজা বন্ধ করছ কেন ?

আপনি হোটেলে যাবেন, আপনার জিনিসপত্র সঙ্গে এনে বেল বাজাবেন। তখন দরজা খুলব, তার আগে না।

অগত্যা শওকত জিনিসপত্র নিয়ে আসে। রাতের খাবার দাবারের পর শওকত তার বিছানায় গা এলিয়ে শুয়ে আছে। নীলা পানি ও গ্লাস দিতে আসে। শওকত ফরিদের কথা জানতে চায়। সে কোথায় ? নীলা জানায় ফরিদ বরিশাল গেছে। সেখানে এক বালক বাবার আবির্ভাব ঘটেছে। শত শত মানুষ তাকে কদমবুসি করছে। সে পানি পড়া দেয়। ফরিদে গেছে তার ছবি তুলতে। শওকতের ঢাকা আসার উৎসাহটাই নষ্ট হয়ে

যায়। সে কালই চলে যাবে বলে জানায়। নীলা বলে সে যেতে পারে তবে কাল সারাদিন তার সাথে থাকতে হবে। নীলা একটা স্কুলে পড়ায় সেখানে শহরের কর্মজীবী ছেলেমেয়েরা আসে। শওকতকে সে সেখানে নিয়ে যাবে।
পাশের ঘর থেকে নীলার মার রণরঙ্গিনী গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। তিনি বলছেন অসম্ভব আমি তোমার সঙ্গে বাস করব না। কী ব্যাপার দেখতে যায় নীলা। গিয়ে দেখে হোসেন সাহেব মশারির নিচে টর্চলাইট জালিয়ে খবরের কাগজ পড়ার চেষ্টা করেন আর তা নিয়েই লেগে যায় দ্বন্দ্ব।

হোটেল বয় শামছু তার মালিককে পড়ালেখা করার ইচ্ছের কথা জানায়। মালিক খ্যাকিয়ে ওঠে, লেখাপড়া কইরা কী হইব উকিল, ব্যারিস্টার, জজ ? তোরে স্কুলে পাঠাব আমার রেস্টুরেন্ট কে চালাইব ? তোর শ্বশুর, লেখাপড়ার ধান্দা মাথা থাইক্যা দূর কর। মন দিয়া কাজ কর। কাজেই উন্নতি। ছেলেটার বুক ফেটে কান্না আসে।

শওকত ও নীলা কর্মজীবী শিশুদের স্কুলে যাচ্ছে। যাওয়ার পথে তারা নানা রকম দৃশ্য দেখে। একটা মেয়ে স্কুলে যাচ্ছে। তার বই খাতা ও পানির বোতল হাতে তারই সমবয়সী আরেকটা মেয়ে যাচ্ছে। বাবা আর ছেলে মিলে ঠেলা চালাচ্ছে। নীলা শওকতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, দেখেন শওকত ভাই, এদের কথা কেউ ভাবছে না।
শওকত বলে, তুমি তো ভাবছ।
আমার একার ভাবনায় কী হয় ?
তুমি যে একা ভাবছ তা কিন্তু না।
কেউ না কেউ ভাবছে বলে কর্মজীবী শিশুদের জন্য স্কুল হয়েছে।
একটা টেম্পু এসে তাদের পাশে দাঁড়ায়। নয় দশ বছরের একটা ছেলে চিৎকার করে যাত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গুলিস্তান দুই টেকা। গুলিস্তান দুই টেকা। নীলা হাত ইশারায় ছেলেটিকে ডাকে। ছেলেটি নীলার কাছে আসে। নীলা বলে, তোমার নাম কী ?
বাবুল।
বাবুল তোমার পড়াশোনা করতে ইচ্ছা করে না ?
ছেলেটা কোন জবাব না দিয়ে আগের জায়গায় ফিরে যায় এবং আবার চিৎকার শুরু করে গুলিস্তান দুই টেকা। গুলিস্তান দুই টেকা।
শওকত এতক্ষণ চুপচাপ দেখছিল। এবার সে মুখ খোলে,
এইসব মূঢ় ম্লান মুখে
দিতে হবে ভাষা
শান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।

নীলা বলে কবিতা খুব সুন্দর। সমস্যা হলো বাস্তব কবিতার মতো না। বাস্তব হলো- গুলিস্তান দুই টেকা, গুলিস্তান দুই টেকা।

তেইশ

ঢাকা আসার দিন শওকত যে হোটেলে চা খায় আবার সেই হোটেলে ঢোকে। শামছু এগিয়ে আসে। শওকত বলে, তোমার দোকানের বিখ্যাত তেহারি খেতে এসেছি। সঙ্গে কিছু নিয়েও যাব। শামছু জিজ্ঞেস করে, পার্সেল ? শওকত জানতে চায় সঙ্গে খাবার নিয়ে যাওয়াকে কি পার্সেল বলে ? শামছু বলে, হ্যাঁ পার্সেল বলে। শামছু তেহারি আনতে যায়। কিছুক্ষণ পর এক প্লেট তেহারি এনে শওকতের সামনে রাখে। শওকত শামছুর পড়ালেখার ব্যাপারটা কতদূর এগুলো তা জানতে চায়। শামছু জানায় তার মালিক রাজি হয়নি। শওকত তার মালিকের সাথে কথা বলতে চায়। শামছু গিয়ে হোটেল মালিককে বলে শওকতের কথা। প্রথমে না করলেও পরে হোটেল মালিক শওকতের সাথে কথা বলতে রাজি হয়।

হোটেলের মালিক প্রথম জানতে চায় শওকত সাংবাদিক না কী ডিবি পুলিশ। শওকত বলে সে এসবের কিছুই না। সে স্কুল শিক্ষক। বিপজ্জনক লোক নয় দেখে হোটেল মালিক স্বস্তি পায়। সে শওকতকে জিজ্ঞেস করে, বলেন বিষয় কী ?

শওকত তাকে জিজ্ঞেস করে, আপনার ছেলেমেয়েরা কী স্কুলে পড়ে ? শওকতের এই প্রশ্নে হোটেল মালিক ভাবে শওকত বোধহয় গৃহশিক্ষকতা খুঁজছে সে ঝটপট জবাব দেয়, পড়ে। তবে তাদের প্রাইভেট মাস্টার লাগবে না। মাস্টার আছে। সপ্তাহে চারদিন বাসায় এসে পড়ায়। শওকত বলে, নিজের ছেলেমেয়েদেরতো ভাল যত্ন নিচ্ছেন। শামছু নামে যে ছেলেটা কাজ করে তার পড়াশোনা করার আগ্রহ, তাকে সুযোগটা দিচ্ছেন না কেন ?

এই আপনার কথা। শুনেন ভদ্রলোক, শামছুরে আমি কাজ করার জন্য নিয়েছি। লেখাপড়া শিখিয়ে লায়েক বানানোর জন্য কাজ দেই নাই।

খুব অনুনয় করে শওকত বলে, অতি দরিদ্র একটা ছেলে। অভাবে পড়ে আপনার এখানে কাজ নিয়েছে। সামান্য কিছু সময়ের জন্য ছেড়ে দিলে সে পড়াশোনাটা করতে পারে। এইটুকু দয়া তাকে আপনি করবেন না ? একজন মানুষ যদি অন্যজনকে সাহায্য না করে তাহলে চলবে কীভাবে ?

আপনি একজনকে সাহায্য করবেন। কোনো একজন অন্য কেউ আপনাকে সাহায্য করবে।

ভাই সাহেব শুনেন, আমারে কেউ কোনো দিন দয়া করে নাই। আমি যা করেছি নিজের

চেষ্টায় করেছি।

তাহলেতো আপনিই সবচেয়ে ভাল জানবেন, অন্যের জন্য মানুষের দয়া, সাহায্য সহযোগিতা কত প্রয়োজন। ভাই আপনি ছেলেটার জন্য একটু সুযোগ করে দিন। আপনার দেয়া সামান্য সুযোগ কাজে লাগিয়ে সে হয়ত একদিন অনেক বড় কিছু করবে।

আচ্ছা যান, ব্যবস্থা করব। এতে আমার কাজের বিরাট ক্ষতি হবে। তার পরেও কথা যখন দিয়েছি- দিয়েছি। মরদ কা বাত, হাতি কা দাঁত আসেন চা খান। টাকা দিতে হবে না ফিরি চা। বিনা পয়সার চা খেয়ে কয়েক প্যাকেট তেহারি নিয়ে শওকত নীলাদের বাসায় আসে। নীলার বাবা হোসেন সাহেব খুব আগ্রহ নিয়ে তেহারি খান। শওকত নীলার খোঁজ করতেই তিনি জানান, আজ বুধবার। আজ নীলার সংগ্রহের দিন। সংগ্রহ দিবসে সারাদিন সে ব্যস্ত থাকে। শওকত জিজ্ঞেস করে সংগ্রহ দিবস মানে ?

হোসেন সাহেব আবার তার কথার ঝুড়ি খুলে বসেন, সপ্তাহে একদিন বুধবার নীলা ছাত্র সংগ্রহে বের হয়। কর্মজীবী ছেলেমেয়েদের স্কুলে আনার ব্যাপারে বের হয়। তাদের মালিকদের সঙ্গে কথা বলে। তাদের কনভিন্স করে। যে কোনো বিষয়ে কাউকে কনভিন্স করার ব্যাপারে আমার মেয়ে ওস্তাদ। আমার আবার উল্টো ব্যাপার। আমি কাউকেই কোনো বিষয়ে রাজি করাতে পারি না বরং অন্যের সব কথাতেই রাজি হয়ে যাই। আচ্ছা শওকত তেহারি আরেক প্লেট খেতে ইচ্ছা করছে। খাওয়াটা কী ঠিক হবে ?

শওকত মাথা নেড়ে নিষেধ করে। হোসেন সাহেব আবার বলতে থাকেন, আচ্ছা ঠিক আছে থাক। এই দেখ আমার স্বভাব। তুমি নিষেধ করলে সঙ্গে সঙ্গে না খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। এই স্বভাবটা বদলানো দরকার। যেসব পুরুষের এই স্বভাব থাকে তারা তাদের স্ত্রীর কথায় উঠবস করে। তাদের জীবন অতি দুঃখের। আশা করি আমাকে দেখে এটা বুঝতে পারছ।

নীলা বেরিয়েছে তার ছাত্রছাত্রী খোঁজার কাজে। একটা ফার্নিচারের দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে দেখে ছোট ছোট দুটি ছেলে ফার্নিচার পালিশ করছে। নীলা তাদের সঙ্গে কথা বলে, প্রথমে সে ভেবেছে এরা দু'জন ভাই। পরে জানতে পারে- না, ভাই নয়, একটি ছেলে ক্লাস টু পর্যন্ত পড়েছে। আরেকটি মোটেই কিছু জানে না। ছেলে দুটিকে নীলা কর্মজীবী শিশুদের স্কুলে ভর্তি হতে বলে। ছেলে দুটি বলে তাদের মালিক রাজি হবে না। নীলা ফার্নিচার দোকানের মালিকের সাথে কথা বলে, আমি ফার্নিচার কিনতে আসিনি। আমি অন্য বিষয়ে কথা বলতে এসেছি। দোকানের মালিক বলে,

জ্বি আপা বলেন।

আপনার দোকানে ফার্নিচার পালিশের কাজ যে দুইটা ছেলে করে তারা কেমন কাজ করে ?

ছেলে দু'টি খুবই দুষ্টু। সুযোগ পেলেই দু'জন মারামারি করে তবে কাজ ভাল করে। আমি ছেলে দু'জনের পক্ষে আপনাকে ধন্যবাদ দিতে এসেছি।

আপা বুঝলাম না।

এত অল্প বয়েসী ছেলেমেয়েদের কাজে লাগানো অপরাধ। বিদেশে এই অপরাধে মালিকের জেল-জরিমানা হয় তবে আমাদের দেশের অবস্থা ভিন্ন। এখানে এরা কাজ না করলে না খেয়ে থাকবে। আপনি এদের কাজ দিয়েছেন, খেতে দিচ্ছেন, থাকতে দিচ্ছেন- এ জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

আপা আপনার কথা শুনে ভাল লাগল। এই রকম করে কেউ বলে না। উল্টা সবাই ভাবে পুলাপান খাটায়ে মারি। এদের আমি বেতন দেই। সপ্তাহে ছুটি আছে। তিন মাসে, ছয় মাসে বাড়িতে যাওয়ার ছুটি পায়।

অবশ্যই আপনি যা করছেন ভাল করছেন।

এরা কাজও শিখছে। এই বিদ্যা পরে কাজে লাগবে। আব্দুল গনি নামে আমার কাছে এই বয়েসের একটা ছেলে কাজ করত। এখন কাজ-টাজ শিখে নিজেই বংশাল রোডে দোকান দিয়েছে।

বাহ্ ভাল তো।

ঈদে-চাঁন্দে আসে। আমাকে কদমবুসি করে দোয়া নিয়ে যায়।

আপনার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল। ভাই তাহলে উঠি। ও আচ্ছা একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, বাচ্চা দু'টির জন্যে আপনি এতই যখন করেছেন আরেকটু করেন না কেন?

আর কী করব?

বাচ্চা দু'টাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন না কেন?

স্কুলে ভর্তি! সারাদিন স্কুল করলে আমার কাজটা কে করবে?

কর্মজীবী বাচ্চাদের জন্যে বিশেষ ধরনের স্কুল আছে। দিনে দু'ঘণ্টা করে ক্লাস হয়। পড়াশোনার কোনো খরচ নেই। সব খরচ স্কুল দেয়।

মালিক চুপ করে থাকে। কিছু বলে না।

আমরা যারা সুবিধাজনক অবস্থায় আছি তারা যদি ওদের জন্যে না করি তাহলে কে করবে?

আপা আপনিতো আমাকে ভাল প্যাঁচের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন?

আপনি প্যাঁচের মধ্যে ছিলেন আমি প্যাঁচ খোলার চেষ্টা করছি।

ঠিক আছে আপা আমি ব্যবস্থা করছি।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ভাই এখন যাই।

না বসেন। কিছু মুখে দিয়ে তারপর যাবেন। এখানে ভাল লাচ্ছি পাওয়া যায়। লাচ্ছি আনায়ে দেই। গরমের মধ্যে ভাল লাগবে।

কিছুক্ষণ নীলার জন্য অপেক্ষা করে শওকত বের হচ্ছে। হোসেন সাহেব তাকে আটকায়। কোথায় যাবে জানতে চায়। শওকত বলে, সে কিছুক্ষণ ঘুরবে। তার ঘোরার সময় যদি কুড়ি মিনিটের বেশি না হয় তাহলে হোসেন সাহেবও তার সাথে যেতে চান।

হোসেন সাহেবকে নিয়েই বের হয় শওকত। হোসেন সাহেব হলুদ রঙের ক্যাবে কখনো চড়েননি সুতরাং ঠিক হয় তারা একটা হলুদ রঙের ক্যাব নিয়ে লং ড্রাইভে যাবেন। একটি ক্যাবে ওঠেন তারা। কিন্তু কোনদিকে যাবে তা বলতে পারে না ড্রাইভারকে। শওকতের এনজিও পরিচালিত স্কুল দেখার খুব ইচ্ছে। শেষে তারা ক্যাব নিয়ে একটি এনজিও পরিচালিত স্কুলে যায়।

তাঁরা ঘুরে ফিরে স্কুল দেখেন। স্কুলের পরিচালকের সাথে কথা বলেন। তাঁদের পড়ানোর পদ্ধতি নিয়ে কথা বলেন। শেষে গার্মেন্টস-এর কাজ করা একজন ছাত্রী তাদের একটা গান শোনায়,
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলরে...
এনজিও স্কুল দেখে হোসেন সাহেব রীতিমত বিস্মিত। তিনি বলেন, শওকত তুমি কী একটা জিনিস বুঝতে পারছ ? দেশে নীরবে একটা বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে। কেউ কিছু টের পাচ্ছে না। দেশ নিঃশব্দে বদলে যাচ্ছে।
What a pleasant surprise!

চব্বিশ

শওকত গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। যাওয়ার সময় নীলা বলে ভাইয়াকে আপনাদের গ্রামে যেতে বললেন, আমাকে তো বললেন না ? শওকত বলে, তুমিও এসো। নীলা বলে, আমি সেধে নিমন্ত্রণ নেই না। ইচ্ছে হলে কারো বলার অপেক্ষায় থাকব না। নিজের থেকেই যাব। আপনাকে আমার বিশেষ কিছু কথা বলা দরকার। শওকত বলে, বল। নীলা বলে, না এখন না। বিশেষ কথা বিশেষ সময়ে বিশেষ পরিবেশে বলতে হয়। এই বলে নীলা শওকতের সামনে থেকে চলে যায়। শওকতও পথে নামে।

একটা ঠেলা গাড়িতে নিজের জিনিসপত্রসহ বসে আছে ফরিদ। ঠেলা গাড়ি চলছে। বাবা ও ছেলে ঠেলা গাড়ি ঠেলছে। ছেলেটির বয়স ১২-১৩ বছর হবে। তার নাম মজনু। ফরিদ ওর সাথে কথা বলে। ছেলেটা জানায় বড় হয়ে সে ঠেলা চালাবে। ওর

লেখাপড়া করতে ইচ্ছে করে না। কোনো চায়ের দোকানের সামনে ঠেলা থামাতে বলে ফরিদ। সেই অনুযায়ী চায়ের দোকানের সামনে ঠেলা থেমে যায়। ফরিদ, ঠেলাওয়ালা ও তার ছেলে মজনু চা খায়। মজনু চাতে একটা বনরুটি ভিজিয়ে খায়। চা-এ বন রুটি চুবিয়ে খেতে সে খুব আনন্দ পায়।
ফরিদ মজনুর লেখাপড়ার ব্যাপারে ঠেলাওয়ালার সাথে কথা বলে। অনেক যুক্তি তর্কের পর ঠেলাওয়ালা মজনুকে স্কুলে পাঠাতে রাজি হয়। ফরিদ একটা কাগজে স্কুলের ঠিকানা লিখে ঠেলাওয়ালাকে দেয়।

শওকত চলে যাবার পর নীলা তার ভাইয়ের ঘরে ঢোকে। সেখানে দেয়ালে শওকত একটা কার্টিজ পেপার ঝুলিয়েছে। তাতে বড় বড় অরে লেখা, কেমন আছিস ফরিদ?
ভাইয়ের ঘর থেকে নীলা নিজের ঘরে যায়। সে গুম হয়ে বসে থাকে। তার খুবই মন খারাপ। নীলার বাবা হোসেন সাহেব এসে নীলার ঘরে ঢোকে। নীলাকে দেখে তিনি বলেন, দেখে মনে হচ্ছে তোর খুবই মন খারাপ। তুই কান্নাকাটিও করেছিস। ঘটনাটা কী?
ঘটনা হলো আমার মন খারাপ।
তোর মন খারাপের সঙ্গে কি শওকতের কোনো সম্পর্ক আছে?
বাবা প্লিজ আমাকে বিরক্ত করবে না।
হোসেন সাহেব নীলার ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

খেয়া নৌকায় যাচ্ছে শওকত। নৌকার মাঝি ও তার ছেলে খেয়া পারাপার করে। নৌকা পাড়ে ভিড়লে সব যাত্রী নেমে যায়। শওকত নামে না। সে মাঝির সাথে কথা বলতে চায়। শওকত মাঝিকে বলে শোনো মাঝি, ছেলেকে লেখাপড়া করাইবা না?
মাঝি বলে, আমি একলা পারি না। শরীরে বল পাই না।
শোনো, লেখাপড়াটা অনেক বড় জিনিস। জিনিসটা যে কত বড় বুঝাইয়া বলতে পারব না। আচ্ছা তোমারে বুঝানোর চেষ্টা করি। মনে কর তুমি একটা ঘরের মধ্যে আছ। ঘরের অনেক দরজা অনেক জানালা। সব বন্ধ। যখন লেখাপড়া করতে শুরু করবে একটা একটা করে ঘরের দরজা জানালা খুলতে থাকবে। বুঝেছ?
বুঝেছি।
এনজিওরা ভাল স্কুল খুলেছে পাঠিয়ে দেখ।
খরচ আছে না?
সরকারের আইন হইল সব ছেলেমেয়েদের অবশ্যই স্কুলে ভর্তি করতে হবে।
প্রাইমারি স্কুলের লেখাপড়া ফ্রি। এক পয়সাও লাগে না।
শুনে মাঝি অবাক বনে যায়। বলে, বলেন কী?

শওকত পুনরায় তাকে বুঝিয়ে বলে, শোন ২০০১ সাল পর্যন্ত ছেলেমেয়েরে প্রাইমারি স্কুল পাঠাইলে সরকার থেইকা গম দিত। আর এখন সরকার গ্রাম এলাকার প্রাইমারি স্কুলে গরিব ছেলেমেয়েদের মধ্য হতে ৪০ ভাগ ছাত্রছাত্রীকে উপবৃত্তি দিয়ে লেখাপড়ায় সাহায্য করে। প্রতি পরিবার থেকে একজন গেলে দেয় ১০০ টাকা, আর দু'জন গেলে ১২৫ টাকা কইরা পায়। আর মেয়ে যদি আরো ওপরের ক্লাসে ওঠে এবং লেখাপড়া চালায়ে যেতে চায় তাইলে উপবৃত্তি পায়। এমনকী কলেজ পর্যন্ত ফ্রি।
শওকতের কথা শুনে মাঝি অবাক হয়ে যায়। সে ছেলেকে জিজ্ঞেস করে স্কুলে যাবে কী না। ছেলে আনন্দের সঙ্গে সম্মতি জানায়।

ফরিদের দেওয়া ঠিকানা মতো ঠেলাওয়ালা তার ছেলেকে নিয়ে যায়। স্কুলে ভর্তি করে দেয়। স্কুল ঘর থেকে বেরিয়ে সে ঠেলায় এসে বসে। তার চোখ দিয়ে পানি পড়ে। একজন পথচারী তাকে জিজ্ঞেস করে আপনার কী হয়েছে ? সে বলে, কিছু হয় নাই অনেকদিন দুঃখে চোখের পানি ফেলেছি। আইজ আনন্দে চোখের পানি ফেলতেছি। আমার এক ছেলে লেখাপড়া শিখতেছে।

পুকুর পাড়ে বসে আছে যূথী। শওকত এসে উপস্থিত হয়।
শওকতকে দেখে যূথীর হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়। শওকতকে কিছু বুঝতে না দিয়ে সে চুপচাপ বসে থাকে।
শওকত বলে, যূথী কেমন আছ ?
ভাল
মন খারাপ নাকি ?
যূথী কোন কথা বলে না।
তোমার জন্যে সামান্য কিছু উপহার নিয়ে এসেছি। এক প্যাকেট কাজু বাদাম। এক টিন চকলেট। নাও।
বাদাম ও চকলেট পাশে রাখতে রাখতে যূথী শওকতকে বলে, আপনি কী হোটেলে ছিলেন, না বন্ধুর বাসায় ছিলেন ?
বন্ধুর বাসায় ছিলাম।
নীলা নিশ্চয় আপনার খুব আদর-যত্ন করেছে ?
হ্যাঁ করেছে।
আপনাকে সাথে নিয়ে বেড়াতে বের হয় নাই ?
ফরিদ ছিল না। নীলাকে নিয়েই ঘোরাঘুরি করেছি।
চকলেট আর বাদাম নিশ্চয়ই নীলাকে নিয়ে কিনেছেন ?
যূথী শোন, তুমি অকারণে রাগ করছ। রাগটা কমাও। হাসি মুখে কিছুক্ষণ কথা বল।

আমার প্রচণ্ড মাথা ব্যথা। আরেক দিন আপনার সঙ্গে হাসি মুখে কথা বলব। আজ না।
চলে যেতে বলছ ?
হ্যাঁ চলে যেতে বলছি।
শওকত চলে যায়। যূথী কাজু বাদাম ও চকলেট পুকুরে ভাসিয়ে দেয়।

শওকতের গ্রামে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে গানের আসরের ব্যবস্থা করেছে গ্রামবাসী। বশির পাগলা আসবে গান করতে। বশির পাগলা গান গেয়ে মানুষকে পাগল বানিয়ে দেয়। ইয়াকুব গিয়ে যূথীকে খবরটা দেয়। যূথী বলে, হঠাৎ বশির পাগলা আসছে কেন ? তারে কে আনছে।
ইয়াকুব বলে, গ্রামবাসী আনছে। শওকত ভাই আজ ফিরেছে সবার মনে আনন্দ।
শওকত ভাইয়ের সম্মানে গানের আসর ?
জ্বি।
যাও তোমরা সম্মান দেখাও। আমি এইসবের মধ্যে নাই। তোমার শওকত ভাই যেখানে থাকবে সেইখানে আমি থাকব না।
আফা ঘটনা কী ?
কোনো ঘটনা নাই, সিদ্ধান্ত নিয়েছি থাকব না- ব্যস থাকব না। তোমাদের শওকত ভাই মহাপুরুষ। আমি মহাপুরুষ না। আমি অতি সাধারণ মেয়ে। আমার মধ্যে হিংসা আছে, রাগ আছে। মহাপুরুষ আর অতি সাধারণ মেয়ে এক সঙ্গে থাকতে পারে না।
আকাশে পূর্ণিমার ধবধবে চাঁদ উঠেছে। বশির পাগলা দরাজ কণ্ঠে গান করছে,
প্রেমের মরা জলে ডুবে না...

পঁচিশ

ঢাকা শহরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় একটা জায়গায় এসে ফরিদ থমকে দাঁড়ায়। রাস্তার পাশে জড়ো করে রাখা আছে আধভাঙা ইট। সেখান থেকে ইট নিয়ে হাতুড়ি দিয়ে টুকরো করা হচ্ছে। অনেক বয়স্ক, মধ্য বয়স্ক নারী পুরুষের সঙ্গে দু'টি শিশুও ইট ভাঙছে। ফরিদ ক্যামেরা বের করে শিশু দু'টির ছবি তোলে। দূর থেকে তাকে ছবি তুলতে দেখে কনট্রাকটর এগিয়ে আসে। কনট্রাকটর এসে জানতে চায় ফরিদ পত্রিকার লোক কি না। ফরিদ জানায় সে শখের ফটোগ্রাফার। কনট্রাকটর সুন্দর সিন সিনারির ছবি তুলতে বলে। শওকতের পরিচয় জানতে চায়। সে পরিচয় দেয় কনট্রাকটর।
ফরিদ বিপজ্জনক কাজে শিশুদের কেন নিয়োগ করা হয়েছে, এটা আইন সিদ্ধ নয় এমন

কথা কনট্রাকটারকে বলে। কনট্রাকটার ফরিদের কথা হেসে উড়িয়ে দেয়। সে বলে, ইট ভাঙা যদি বিপজ্জনক কাজ হয় তাহলে গ্লাস ফ্যাক্টরির কাজ, পিচ ঢালার কাজ, ওয়েল্ডিং মেশিনের কাজ এইসব কী ? ফরিদ তার ছবি তোলার অনেক বিষয় পেয়ে যায়। সে ঘুরে ঘুরে গ্লাস ফ্যাক্টরি, ওয়েল্ডিং মেশিনে, পিচ ঢালার কাজে শিশুশ্রমের ছবি তোলে।

ফরিদের তোলা ছবিগুলো নীলা দেখে। দেখে সে ফরিদকে ছবি তোলার একটা ধারণা দেয়। সেটা এই রকম- একটা কাজের মেয়ের ধারাবাহিক ছবি। প্রথম পর্যায়ের ছবি গ্রামের দশ-এগার বছরের একটা হাসি খুশি মেয়ে। সে আনন্দে ছোটাছুটি করছে, এক্কা দোক্কা খেলছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের ছবি ঢাকা নামের বিশাল এক শহর। গাড়ি, ভীড়, রাস্তার নিয়ন আলো। মেয়েটা ভীত-সন্ত্রস্ত। বার বার ভাবছে আমি কোথায় এসেছি। তৃতীয় পর্যায়ে ছবি হবে কোনো একটা বাড়িতে সে কাজ শুরু করেছে। শুরু হলো তার বন্দী জীবন। শেষ পর্যায়ের ছবি যে বাড়িতে মেয়েটি কাজ করে সেই বাড়ির সবাই কোথাও বেড়াতে গেছে। মেয়েটাকে তালাবদ্ধ করে রেখেছে। সে দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরের মুক্ত জগত দেখছে। নীলা ফরিদকে বলে এই ছবিগুলো সে নীলাকে তুলে দিতে পারবে কি না। ফরিদ বলে নীলা যদি সাবজেক্ট জোগাড় করে দিতে পারে তাহলে সে তুলে দিতে পারবে। নীলা বলে, সাবজেক্ট তাদের বাড়িতেই আছে। তাদের কাজের মেয়ে সালমা।

সকলের অজান্তে ফরিদ সালমার পেছনে আঠার মতো লেগে থাকে ছবি তোলার জন্য। রাত। সালমা বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। আড়াল থেকে ফরিদ তার একটা ছবি তোলে।

ভোর। সালমা একগাদা কাপড় ধুতে বসে। ফরিদ তার একটা ছবি তোলে। দুপুর। সালমা ঘামতে ঘামতে রান্না করছে। ফরিদ ছবি তোলে। বিকেল। সালমা কাপড় ইস্ত্রি করছে। ফরিদ ছবি তোলে।

রাত। টিভি চলছে। হোসেন সাহেব টিভি দেখছেন। ছায়াছন্দ হচ্ছে টিভিতে। সালমা হোসেন সাহেবের পায়ের কাছে মেঝেতে বসে টিভি দেখছে। ফরিদ ছবি তোলে। হঠাৎ ফরিদের মা এসে সালমাকে ধমকিয়ে তুলে দেয়। ফরিদ ছবি তোলে।

রাত বারোটা। মা শুয়ে আছেন। সালমা ঘুম ঘুম চোখে মায়ের মাথায় বিলি কেটে দেয়। ফরিদ ছবি তোলে। নীলা এসে সালমার কাছে আদা-চা চায়। সালমা চা বানাতে রান্না ঘরে যায়। ঘুম চোখে চা বানাতে গিয়ে সালমার হাতের ধাক্কা লেগে একটা কাপ ভাঙে। মা উঠে এসে সালমাকে চড় থাপ্পড় মারে। ফরিদ ছবি তোলে।

সালমার ছবিগুলো ফরিদ বড় করে নিজের ঘরে রাখে। ছবিগুলো হোসেন সাহেব দেখেন, তিনি খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করেন ছবি দিয়ে কী হবে ? ফরিদ জানায়

নির্যাতিত কাজের মেয়ের ছবি। এক্সিবিশন হবে ছবিগুলো দিয়ে। এইকথা শোনার সাথে সাথে হোসেন সাহেব তাকে নিয়ে একটা এক্সিবিশন করার অনুরোধ করেন ফরিদকে। ফরিদ বলে, তোমাকে নিয়ে এক্সিবিশন করব মানে। তুমি কী নির্যাতিত ?
হোসেন সাহেব বলেন, আমি নির্যাতিত না ? তোর মা আমার জীবনটাকে ভাজা ভাজা করে ফেলছে- এইটা তুই দেখছিস না ?
ফরিদ বলে, তুমিও তো মার জীবনটাকে ভাজা ভাজা করে ফেলছ। ভাজায় ভাজায় কাটাকাটি।
এমন সময় সালমা এসে খবর দেয় ফরিদের মা হোসেন সাহেবকে ডাকছেন। হোসেন সাহেব রান্না ঘরে গিয়ে দেখেন স্ত্রী রণরঙ্গিনী রূপ ধরে আছেন। একটু আগে তিনি বাজার থেকে যে মাছ কিনে এনেছেন। সেই মাছ পঁচা। স্ত্রী নির্দেশ দেন এক্ষুণি মাছ ফেরত দিয়ে আসতে হবে। তিনি মাছগুলো ব্যাগে ভরে হোসেন সাহেবেরে হাতে ব্যাগটা ধরিয়ে দেন। হোসেন সাহেব ব্যাগ হাতে বাসা থেকে বেরিয়ে আসেন।

হোসেন সাহেব নিউ মার্কেটের কাঁচা বাজার পর্যন্ত রিকশা ঠিক করে উঠে বসেন। রিকশা চলতে শুরু করে। কিছুদূর গিয়ে তিনি ব্যাগটা ডাস্টবিনে ফেলে দেন। রিকশা চালককে নিউ মার্কেটের বদলে কমলাপুর স্টেশন যেতে বলেন। রিকশা চালক কমলাপুরের দিকে রিকশা ঘোরায়।

ছাব্বিশ

যূথীদের পুকুর ঘাটে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন হোসেন সাহেব। বাচ্চা শিশুর মতো তিনি চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আকাশ দেখেন, মেঘ দেখেন। পাখি ডাকছে তিনি খুবই আনন্দ পাচ্ছেন। আনন্দে তিনি কবিতা আবৃত্তি করেন,
বিহগে ললিত গীতি
শিখায়েছ ভালবাসি
ঢেলেছ ফুলের দলে
স্বরগের শোভারাশি।

যূথী পুকুর ঘাটে এসে হোসেন সাহেবকে শুয়ে থাকতে দেখে খুবই অবাক হয়। সে সালাম দেয়। হোসেন সাহেব যূথীর তত্ত্বতালাশ নেন। চা খাবে কি না জিজ্ঞেস করলে তিনি হাঁ সূচক জবাব দেন। যূথী বলে, চাচাজি, আপনাকে যতবার দেখি, এত ভাল লাগে- আপনাকে দেখে মনে হয় পৃথিবীতে কোনো দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, সমস্যা নেই।
হোসেন সাহেব বলেন, কে বলেছে নেই ? দুঃখ কষ্ট সমস্যা চারদিকে গিজগিজ করছে।

আমি হুট করে বের হয়ে চলে এসেছি। আসার সময় তোমার চাচির সাথে হাইডোজের একটা ঝগড়া করলাম। তারপর পলাতক। মনে হয় খোঁজাখুঁজি করছে। লাভ নেই, সন্ধান পাবে না। শওকতকে নিষেধ করে দিয়েছি- আমি কোথায় আছি সে যেন না বলে। মা যাও চা নিয়ে আস। দু'কাপ চা আনবে। দু'জন পাশাপাশি বসে চা খাব। যূথী চা আনতে চলে যায়। হোসেন সাহেব আবার কবিতা আবৃত্তি শুরু করেন,
আজি বর্ষা রাতের শেষে
সজল মেঘের কোমল কালোয়
অরুণ আলো মেশে।
বেনুবনের মাথায় মাথায়
রং লেগেছে পাতায় পাতায়
রঙের ধারায় হৃদয় হারায়
কোথা যে যায় ভেসে॥

যূথী দুইকাপ চা নিয়ে ঘর থেকে বের হতেই আমিন সাহেবের সামনে পড়ে। কাজের লোক আমিন সাহেবের দু'নলা বন্দুক পরিষ্কার করছে, তিনি তা তদারক করছেন। যূথীকে চা নিয়ে যেতে দেখে তিনি এক কাপ চা চান। যূথী দিতে চায় না। বলে, বাবা তোমাকে পরে বানিয়ে দেব। এখন অন্য একজনের জন্য নিয়ে যাচ্ছি।
আমিন সাহেব বললেন, অন্য একজনের জন্য পরে বানিয়ে নিয়ে যা। আমি বাবা, মুখ ফুটে এক কাপ চা চেয়েছি। আমাকে রেখে অন্য একজন বড় হয়ে গেল।
যূথী নাও, খাও বলে এক কাপ চা আমিন সাহবের সামনে রেখে চলে যায়।
আমিন সাহেব তার লোককে বলে, মেয়েটা কেমন বদমেজাজি হয়েছে দেখেছিস ? তুই একটা কাজ কর- এই চায়ের কাপটা হাতে করে নিয়ে যা। যূথী যেখানে গেছে, সেখানে যাবি। কাপটা তার সামনে আছাড় দিয়ে ভাঙবি। যা এখনই যা।
কাজের লোক পুকুর ঘাটে যায়। যূথীর সামনে আছাড় দিয়ে চায়ের কাপ ভাঙে। হোসেন সাহেব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, এটা কী হলো ? যূথী বলে, বাবা তার রাগ দেখালেন।

খালা পেঁপে কেটে এনে শওকতের সামনে রাখে। এইরকমটা হলেই শওকত বুঝতে পারে খালা কিছু একটা বলতে চায়। শওকত বলে, কী বলতে চাও বলো। খালা সেই পুরানো কথাই আবার বলেন, কাল শেষ রাতে খোয়াবে দেখেছি নীলার সাথে তোর বিবাহ। তুই হাতি চড়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে আসছিস। সাথে ফুটফুটে সুন্দর বউ। খালার কথা শুনে শওকত হাসে। খালা বলে, হাসছ কেন, হাসির কী ঘটল ? আমি খোয়াবে দেখেছি এই বিবাহ হইব।

একটা চিঠি হাতে করে নীলা ফরিদের ঘরে ঢোকে। ফরিদকে সে বলে, My dear brother, আমাদের বাবার সন্ধান পাওয়া গেছে। সে তোমার বন্ধু শওকত ভাইয়ের বাড়িতে ঘাপটি মেরে আছে। ফরিদ বলে, কাল সকালে আমি যাব, বাবাকে নিয়ে আসবো। তুই মাকে জিজ্ঞেস করে আয় মা যেতে রাজি আছে কি না। নীলা বলে, মা যাবে কিনা আমি জানি না, তবে আমি অবশ্যই যাব। তোমার বন্ধুর খালা আমার জন্য বিয়ে ঠিক করেছেন। আমাকে যেতে হবে বিয়ে করার জন্য। এখন শোনো খালা চিঠিতে কি লিখেছেন। নীলা চিঠি পড়ে ফরিদকে শোনায়,

মা নীলা,
আমি খোয়াবে পাইয়াছি তোমার সহিত শওকতের বিবাহ হইতেছে। বিবাহে খুবই আমোদ হইতেছে। আমি খোয়াবে যাহা দেখি তাহাই হয়। আমি নিশ্চিত আল্লাহ্‌পাকের আদেশে এই বিবাহ হইব। শওকত তোমাকে অত্যধিক পছন্দ করে। সে আমাকে অনেকবার বলিয়াছে নীলাকে যদি বিবাহ করিতে না পারে আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না। মা এখন তোমার বিবেচনা।

চিঠি শেষ হলে ফরিদ বলে, শওকত যে তোর প্রেমে দেওয়ানা হয়ে আছে এটাতো জানতাম না। তুই জানতি ?

না আমিও জানতাম না। আমি তো জানি শওকত ভাই যূথীর প্রেমে মজে আছে। যূথীরও খুব বাজে অবস্থা।

ফরিদ বলে, তাই নাকি ?

অন্তরে চোট লাগলো মনে হয় ?

শুধু শুধু কথা বলিস নাতো।

ভাইয়া চল, আমরা সবাই দল বেঁধে যাই। তোমার বন্ধুর বিয়ে দিয়ে আসি।

নির্জন পুকুর ঘাট যূথীর খুব প্রিয়। পুকুর ঘাটের মতোই প্রিয় চাঁদনী রাত। শওকতের চিন্তায় যূথীর ঘুম আসে না। রাতের আকাশে চাঁদ উঠতে দেখলেই যূথীর ইচ্ছে করে শওকতের হাত ধরে হাঁটতে। এই রকম অবস্থায় সমস্ত ধৈর্য আর প্রতীক্ষার বাঁধ ভেঙে শেষ পর্যন্ত যূথী শওকতের কাছে চিঠি লিখতে বসে। সে লেখে,

শওকত ভাই,
আমার জানামতে কোনো মেয়ে আগ বাড়িয়ে প্রেমের চিঠি কোনো ছেলেকে লেখেনি, আমি সাধারণ মেয়েদের মতো না। আমি আলাদা বলেই লজ্জার মাথা খেয়ে আপনাকে চিঠি লিখছি। সারাক্ষণ আমি আপনার কথা ভাবি। প্রতি রাতেই আপনার কথা ভাবতে ভাবতে কাঁদি। এক সময় কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ি। আপনি কী আমার কান্না

থামাতে পারেন ?

চিঠি নিয়ে সে শওকতের বাড়ি যায়। গিয়ে দেখে শওকত বাড়ি নেই। শওকতের খালা বলেন, তুমি আসছ ভালই হয়েছে। শওকতের বিয়ের বিষয়টা নিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করি। তোমার সাহায্য বিনা এইটা হবে না।

শওকত ভাইয়ের বিয়ে ?

হ্যাঁ নীলার সাথে। দু'জন দু'জনের জন্য পাগল।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, তবে আর বলছি কী ? শওকত বলেই ফেলেছে নীলাকে বিবাহ করতে না পারলে সে বিবাহই করবে না। কথাটা শুনে যূথীর মাথা ভোঁ ভোঁ করে ঘুরতে থাকে। সে বাড়ির পথ ধরে। কিছুদূর এসে চিঠিটা কুচি কুচি করে ছেঁড়ে কিন্তু ফেলে না। হাতের মধ্যে মুঠি করে রাখে। বাড়ি এসে তার পুকুর ঘাটে বসে। তার চোখ বেয়ে পানির ধারা নামছে। কুচিগুলো সে পুকুরে ভাসিয়ে দেয়।

শওকত বাড়ি গিয়ে খালার কাছে সব শোনে। শুনেই বুঝতে পারে যূথী কেন চলে গেছে। শওকত সঙ্গে সঙ্গে যূথীদের বাড়ি যায়। যা ভেবেছিল তাই হলো যূথী পুকুর ঘাটে বসে আছে। শওকতকে দেখে যূথীর কান্না আরো বেড়ে যায়। শওকত জানতে চায়, যূথী কাঁদছে কেন ?

কি আশ্চর্য আমি কেন কাঁদছি সেটা আপনাকে কেন বলব ? আপনি কে ?

আমি কেউ না ?

না আপনি কেউ না। আপনি অনেক দূরের একজন মানুষ।

শওকত বলে দূরের মানুষকে কাছের করে নেও। মুহূর্তে যূথীর অন্তর-আত্মায় আনন্দের হিল্লোল খেলে যায়। আনন্দে সে আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। শওকত গিয়ে যূথীর পাশে বসে। যূথীর হাত তুলে নেয় নিজের হাতের মধ্যে। তারপর বলে, আমি সাধারণ একজন স্কুল টিচার, আর... যূথী শওকতের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে শওকতের মুখ চেপে ধরে, কোন কথা বলতে দেয় না। তারা কতক্ষণ যে পুকুর ঘাটে বসে থাকে তা নিজেরাও জানে না।

যূথী তার বাবাকে গিয়ে বলে, হাতিটা দরকার। একদিনের জন্য। আমিন সাহেব অবাক দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

সারা গ্রামে উৎসব পড়ে যায়। বাদ্য-বাজনা, সানাই বাজে। হাতির পিঠে বরযাত্রী আসে। হাতির গলায় ঘণ্টা বাজে টুন টুন।